বর্ণাশ্রম

শ্রীমৎস্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী

প্রণীত

প্রথম সংস্করণ

প্রকাশক

শ্রীগিরিজাভূষণ সরকার, বি. এ.

১৯ বি, প্রাণনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, ভবানীপুর,

কলিকাতা।

মূল্য ৷৷০ আট আনা

১৩৩৩

ওঁ শ্রীহরিঃ

ভূমিকা।

বর্ত্তমানে ভারত অতি উন্নত হইতেছে, ‘তাই সর্ব্বপ্রকার উন্নতি এবং উদারতার কণ্টকস্বরূপ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বা বেদবিধি উল্লঙ্ঘন করাই একমাত্র ধর্ম্ম’, এইরূপ মতবাদিগণ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কতকগুলি অসার এবং অযৌক্তিক মতবাদস্থাপনে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা কৃতকার্য্য হউন তাহাতে আপত্তি নাই ; কিন্তু উহা যতটা অশান্তি এবং অসন্তোষের মাত্রা দিন দিন বর্দ্ধিত করিতেছে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই বাঞ্ছনীয় নহে ; তাহা ছাড়া বেদ এবং তদনুকূল শাস্ত্রসমূহে তাঁহাদের মত অতি অসার এবং ঘৃণ্য বলিয়া উল্লিখিত আছে, ইহাই আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে বুঝিতে পারিয়াছি। তাই বেদ এবং ঋষি প্রণীত গ্রন্থাদি হইতে পূর্ব্বতন আচার্য্যদের প্রতিপাদিত ধর্ম্ম সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলাম। এই গ্রন্থে আমার নিজের ব্যক্তিগত মতামত কিছুই নাই, তাঁহাদের আদর্শ আমি যেরূপ বুঝিতে পারিয়াছি তাহাই ভাষায় প্রকাশ করিয়াছি। ইহাতে যদি কিছু ভ্রম প্রমাদ থাকে তাহা আমায় বুঝিবার ভুল মনে করিয়া সুধীগণ আমাকে জানাইলে কৃতার্থ হইব।

প্রক্ষিপ্তবাদে অভ্যস্ত ক্ষিপ্তজীবের নিকট কিছুই বলিবার নাই এবং তাঁহাদের নিকট কোন আশাও নাই কারণ তাঁহারা চিকিৎসার অতীত। যাঁহারা পিতৃপিতামহগণকে কুসংস্কারাপন্ন অন্ধ মনে করেন না তাঁহারা ইহা দ্বারা কিছু উপকৃত হইবেন বলিয়া আশা করিতেছি। অলমতি-বিস্তরেণ। ইতি—

নিবেদক

গ্রন্থকার।

প্রকাশকের নিবেদন।

আজকাল একটা আক্ষেপোক্তি প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে উঠিয়াছে, যাহার ফলে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বিশেষরূপে ভাবিত হইয়া পড়িয়াছেন। আক্ষেপোক্তিটী হিন্দুজাতির বর্ত্তমান নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক অবনতি লইয়া। স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্যজাতি প্রতিমুহূর্ত্তে উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে; জ্ঞানে, শিল্পে ও বিজ্ঞানে তাহারা জগজ্জয়ী হইতে চলিয়াছে, আর আমরা সেই অনুপাতে অবনতির নিম্নতর হইতে নিম্নতম স্তরে শনৈঃ শনৈঃ উপস্থিত হইতেছি, সেইজন্য ভয় হয়—এইভাবে কিছুকাল চলিলে হিন্দুজাতি পৃথিবীর বক্ষ হইতে চিরতরে লোপ পাইবে। যাহা হউক, এইপ্রকার ভবিষ্যদাশঙ্কা সম্বন্ধে আমরা এখানে কোন মতামত প্রকাশ করিব না, কারণ একমাত্র মঙ্গলময় ভগবানই জানেন হিন্দুজাতির ভবিষ্যৎ ঘনতমসাবৃত কিম্বা কোটিসূর্য্যপ্রভায় ভাস্বর। আমাদের ন্যায় অজ্ঞ ও অপরিণামদর্শীর পক্ষে কিছু বলা নিতান্ত অর্ব্বাচীনতা। পক্ষান্তরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাচীন জাতিসমূহের উত্থান ও পতনের ইতিহাস স্থিরভাবে পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই দৃঢ় প্রতীয়মান হয় যে এই পদদলিত হিন্দুজাতি যেন মৃত্যুকে জয় করিয়াছে; যুগধর্ম্মের প্রভাবে হীনবীর্য্য, বিগতশৌর্য্য হইলেও ইহার দুর্দ্দিন বুঝি চিরস্থায়ী হইবে না, ঘনমেঘ অপসারিত হইবেই হইবে। যাক্, যাহা অনুমান সাপেক্ষ তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত যে, হিন্দুজাতি আজ ব্যাধিদুষ্ট, পতিত; হিন্দুসমাজ বলিতে আমরা অনাচার, অত্যাচার, ব্যভিচার ও স্ত্রীআচার দ্বারা শাসিত এক প্রকার অপূর্ব্বগণ্ডিবিশেষ বুঝিয়া থাকি; যেখানে বশিষ্ঠ

বিশ্বামিত্র ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ত্রিকালদর্শী ঋষিগণের স্থান নাই, তাঁহাদের স্থান ডারউইন (Darwin) স্পেনসার (Spencer) ও হাক্সলি (Huxley) অধিকার করিয়া বসিয়াছে; যেখানে নিষ্ঠা, আচার, ভগবদ্ভক্তি ও ব্রহ্মচর্য্যাদি কুসংস্কারে পর্য্যবসিত হইয়াছে, আর অসংযম, কদাচার নাস্তিকতা ও অসবর্ণ বিবাহরূপ রিরংসা-বৃত্তি যুগধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে; যেখানে ভগবদ্-প্রসঙ্গ গঞ্জিকাসেবনের অবশ্যম্ভাবী ফল বলিয়া পরিগণিত হইতে চলিয়াছে, আর তৎস্থানে নিগুর্ণ ব্রহ্মের সূক্ষ্মপ্রেম তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টায় আছে।

এখানে হয়ত অনেকে বলিবেন যে, 'এইরূপ পুরাতন আদর্শ আকড়াইয়া থাকিলেই কি হিন্দুজাতির অভ্যুত্থান হইবে? বরং এইরূপ কুসংস্কারই ত যত সর্ব্বনাশ করিয়াছে। জগতের অন্যান্য জাতি যে ভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, আমাদিগকেও তদনুরূপ অগ্রসর হইতে হইবে, পিছাইয়া পড়িলেই সর্ব্বনাশ! বৈদিক যুগের আদর্শ বর্ত্তমানযুগে খাটিতে পারে না, অতএব কোনরূপ চেষ্টাকরা নির্ব্বুদ্ধিতা ও পণ্ডশ্রম মাত্র। আমাদিগকে যুগধর্ম্মের স্রোতে গা ভাসাইতে হইবে।' আমরা কিন্তু একথায় তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিব, "তাহা হইতে পারে না; অন্য জাতির পক্ষে যাহাই হউক না কেন, হিন্দুর আদর্শ চিরদিনই সমান, ইহা অপরিবর্ত্তনীয়। আদর্শ চ্যুতিতেই তাহার এই ঘোর অবনতি, আদর্শ রক্ষাতেই তাহার কল্যাণ।" নিম্নে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

আমাদের স্থূল জ্ঞানে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, বৈশিষ্ট্যই প্রত্যেক জাতির প্রাণ, যে জাতি তাহার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারিয়াছে, সেই জাতিই ঘাতপ্রতিঘাতপূর্ণ পরিবর্ত্তনশীল জগতের সহিত নিজের সত্তাকে বজায় রাখিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, সেইরূপ যেজাতি অন্যজাতির বাহ্যচাকচিক্যে প্রলুব্ধ হইয়া নিজের স্বতন্ত্রতাকে বিসর্জ্জন দিয়া

নিজের প্রত্যেক রক্তকণার সহিত বিদেশীয় ভাবধারা মিশাইয়া লইতে শিখিয়াছে, সেইপ্রকার সঙ্করজাতির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ইহা ধ্রুব সত্য।

এখন দেখা যাক, হিন্দুর বৈশিষ্ট্য কিছু আছে কিনা, যদি কিছু থাকে তাহা কি প্রকার?

পৃথিবীর অন্যান্য-জাতির পক্ষে একটী সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম সম্ভব, কারণ তাহাদের প্রত্যেকের ধর্ম্মে এমন কতকগুলি বাঁধা ধরা নিয়ম আছে, যাহা সেই সেই ধর্ম্মাবলম্বী প্রত্যেককেই মানিতে হইবে, নতুবা সে অধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং সেই ধর্ম্মে তাহার কিছুমাত্র অধিকার থাকিবে না। আপনি খৃষ্টান, আপনাকে যিশুখৃষ্টে বিশ্বাস করিতেই হইবে এবং বাইবেলের অনুশাসন মানিয়া চলিতে হইবে, যদি তাহা না পারেন বা না করেন, আপনি নিজেকে ক্রিশ্চিয়ান বলিয়া প্রচার করিতে পারিবেন না, অধিকন্তু উক্ত ধর্ম্মের সকল প্রকার সুখ ও সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবেন। এইরূপ ইস্‌লাম ধর্ম্মের পক্ষেও খাটে; কিন্তু হিন্দুর কাছে এইরূপ সার্ব্বজনীন কোনও ধর্ম্ম নাই; হইতেও পারে না। একটু চিন্তা করিলেই ইহার কারণ আমরা দেখিতে পাইব; একের যাহাতে সহজে বিশ্বাস উৎপন্ন হয়, অথবা তাহার ব্যক্তিগত যে সকল ধারণা আছে তাহা যে অন্যের সহিত মিলিবে এমন কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নাই; সুতরাং একের পক্ষে যে ব্যবস্থা করা যাইবে অন্যের পক্ষে যে তাহা খাটিবে এমন কোন কথা নাই। জগতে স্বীয় উন্নতি সাধন করিতে হইলে ব্যক্তিগত বিশেষত্ব তথা নিজ নিজ সংস্কার অনুযায়ী চলা প্রয়োজন; কালে নিজ আত্মবিকাশের সহিত অথবা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফলে যদি কেহ নিজ বর্ত্তমান মত পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য উচ্চতর মত গ্রহণ করে এবং তদনুযায়ী নিজ জীবন গঠন করে তাহা হইলে সে নিন্দনীয় হইবে না, পরন্তু শাস্ত্র

তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবে। আমরা সকলেই জানি একজন সন্ন্যাসীর ব্রহ্মচর্য্য অথবা সত্যের আদর্শ গৃহীর আদর্শ হইতে ভিন্ন প্রকারের; একজন রাজ্যশাসনকর্ত্তা যে নীতির অনুসরণ করেন, একজন তিতিক্ষা-পরায়ণ ব্রাহ্মণ সেই নীতির অনুসরণ করিতে পারেন না—ইহা আর বিশদ করিয়া কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না।

অধ্যাত্মপন্থী প্রত্যেক হিন্দুর পক্ষে নিজের সামর্থ্য ও অধিকার ভেদে ধর্ম্মানুশীলনও বিভিন্ন প্রকারের। ব্যক্তিগত বিভিন্নতা অনুসারে নিয়ম প্রণয়ন করাই হিন্দুশাস্ত্রের বিশেষত্ব। শাস্ত্র ছাড়িয়া দিলেও যদি ক্রমোন্নতিবাদ মানিতে হয়, তাহা হইলেও ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, আমরা অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রেই বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন জীব হইলেও সকলে একস্তরে অবস্থিত নহি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে একজন সাধারণ কৃষক ও একজন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ উভয়েই মানুষ, কিন্তু তাই বলিয়া কি উভয়ের সংস্কার, ধর্ম্ম, বিশ্বাস প্রভৃতি উপজ্ঞাসমূহ এক প্রকারের হইতে পারে?

এক্ষণে যদি এই কৃষকের আধ্যাত্মিকবিকাশের নিমিত্ত ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া যায়, তাহা হইলে কি তাহাকে একেবারেই নির্গুণ ব্রহ্মের বিষয় বলা কর্ত্তব্য অথবা নিম্নতর স্তর (সাকারপূজাদি) হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহার মানসিক বিকাশের সহিত ক্রমোচ্চস্তরের তত্ত্ব তাহাকে শুনান যুক্তিসঙ্গত?

এই বর্ণাশ্রমধর্ম্মরূপ বৈশিষ্ট্যই হিন্দুজাতির প্রাণ; অধিকারীর নির্ণয় ও তন্নিমিত্ত যম নিয়মাদির ব্যবস্থা করাই হিন্দুশাস্ত্রের মৌলিকত্ব। এই মৌলিকত্ব প্রভাবেই সে বিজাতীয় শত সহস্র অত্যাচার সহ্য করিয়া আজও জীবিত আছে—লুপ্ত হয় নাই।

অনেকের ধারণা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মূলে কোনও ভিত্তি নাই বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুগে তাহা মোটেই উপযোগী নহে। এরূপ ধারণা যে নিতান্ত

অমূলক ও অসার তাহা পুস্তকপাঠে সম্যক্ অবগত হওয়া যায়। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"সৃষ্টিধারা আরোহিণী ও অবরোহিণী ভেদে দ্বিবিধ। একটী তমোগুণ হইতে সত্ত্বগুণে লইয়া যায়, অপরটী সত্ত্বগুণ হইতে তমোগুণে আনয়ন করে। প্রথমটি হইতে শিশুদেহের উৎপত্তি ও দ্বিতীয়টী হইতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রথম প্রকারে তমোগুণ হইতে উন্নতির দ্বারা তমোরজঃ গুণে মিলিত হয়, পরে রজঃসত্ত্বে মিলিত হয় এবং অবশেষে সত্ত্বগুণে উপনীত হয়; প্রকৃতির এই প্রধান চারি বিভাগের জন্য চারিবর্ণরূপ শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। তিনগুণের সংমিশ্রণ দ্বারা চারিটী বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে সুতরাং উহার সত্তা প্রকৃতির সত্তায় অবস্থিত, এবং প্রকৃতি অনাদি বলিয়া বর্ণও অনাদি···। তজ্জন্যই এই বর্ণব্যবস্থা প্রকৃতির প্রতি অণুপরমাণুতে গ্রথিত।" অতএব স্পষ্টই ধারণা জন্মিবে যে মনুষ্য ব্যতীত অন্যান্য সৃষ্টি ব্যাপারেও উচ্চনীচ বর্ণ দৃষ্ট হইবে। গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন—"......অশ্বত্থ বৃক্ষের ন্যায় বট, বিল্বাদি ব্রাহ্মণ শ্রেণীর অন্তর্গত। শাল ও শেগুণ ক্ষত্রিয় শ্রেণীর অন্তর্গত। আম কাঁটাল ইত্যাদি বৈশ্য ও বাঁশ, ওষধি প্রভৃতি শূদ্র শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া ভাগ করা হইয়াছে। স্বেদজ প্রাণীর ভিতর যাহারা পুষ্পাদিতে জন্ম গ্রহণ করে, মধ্বাদি পান করে, তাহারা ব্রাহ্মণ শ্রেণীর অন্তর্গত......"ইত্যাদি।

অতএব 'তুমি উচ্চ, আমি নীচ' বলিয়া দুঃখ করিবার কিছুই নাই; বর্ণবিভাগ প্রকৃতির অভিপ্রেত।

অনেকে গীতায় "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" ইত্যাদি তুলিয়া তাহা নিজেদের স্বার্থমত কদর্থ করেন, কিন্তু তাঁহারা জানেন না, যে এখানে 'গুণ' অর্থে প্রকৃতির গুণ সূচিত হইতেছে। যেরূপ গুণ হইতে দেহের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ দেহদৃষ্টে গুণও অনুমিত হইতে পারে।

গ্রন্থকার শাস্ত্র হইতে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন ঃ—

বক্ত্রং সৌম্যং সমবৃত্তং অমলং শ্লক্ষ্ণং সুসম্যগ্ ভূপানাম্।

বিপরীতং ক্লেশভুজাং মহামুখং দুর্ভগানাঞ্চ॥" ইত্যাদি

ইহা আপ্তবাক্য, প্রকৃত হিন্দু পূর্ব্বে ইহা বিশ্বাস করিত, এখনও করে, ভবিষ্যতেও করিবে।

আজকাল শূদ্রের ও স্ত্রীলোকের পূজা ও বেদাধিকার লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছে এবং এক শ্রেণীর লেখক ও সংস্কারক তাহাদিগকে অধিকার দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন; প্রবন্ধ ও শুদ্ধিক্রিয়া দ্বারা প্লাবিত করিয়া তুলিয়াছেন। বাস্তবিক তাহাদের অধিকার কতখানি এবং তাহার বেশী পাইলে ইষ্ট কিম্বা অনিষ্ট হইতে পারে তাহা পুস্তকে যথাস্থানে শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে পুনরুল্লেখ করিলাম না কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যুগধর্ম্মের অপূর্ব্ব প্রভাবে ও বিংশশতাব্দীর তথা কথিত সভ্যতার উজ্জ্বলরশ্মিচ্ছটায় আমরা আজ বর্ণাশ্রমধর্ম্মরূপ হিন্দুজাতির জীবনীশক্তিকে অলীক অসারও ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের শূদ্রাদি নিম্নবর্ণপীড়ন করিবার অপূর্ব্ব যন্ত্রবিশেষ বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছি; বেদ পুরাণ আমাদের নিকট প্রক্ষিপ্ত, হিন্দুদেব-দেবী মূর্ত্তিমতী অশ্লীলতা, সতীত্ব একটা কুসংস্কার ইত্যাদি।

একটী ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয় এখানে সংক্ষেপে কিছু বলিলে আশাকরি নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

পাশ্চাত্যদর্শন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত জনৈক দার্শনিকপ্রবরের সহিত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল; তিনি ও তজ্জাতীয়গণ বলেন, বেদান্তশাস্ত্রোক্ত নির্ব্বিকল্পসমাধি মস্তিষ্কবিকারের নামান্তর মাত্র। কারণ ক্যাণ্ট্ (Kant) প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ বলিয়াছেন, যে, 'মানুষের চিন্তা অথবা ধারণা যাহা একবার চৈতন্য (Consciousness) সীমার

মধ্যে আসিয়াছে তাহা চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই প্রকাশ করিতে পারা যায়; চিন্তা বা ধারণা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হইতে পারে, কিন্তু চেষ্টা করিতে ভাষায় প্রকাশ করিতে কেন পারা যাইবে না?' তাঁহারা এই প্রকার যুক্তি দিয়া থাকেন—'সুরাপায়ী মত্তঅবস্থায় যে সব প্রলাপোক্তি করে, তাহা সুস্থ অবস্থায় স্মরণ করিতে পারে না, (কারণ মত্ততা অর্থেই মস্তিষ্কবিকার বুঝায়) অর্থাৎ সুরাপায়ী তাৎকালিক বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া যায়, ইহা প্রমাণীকৃত সত্য; এখন কথা হইতেছে যে, নির্ব্বিকল্পসমাধির উপলব্ধি সমূহ যদি ভাষায় প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করিতে না পারা গেল, তাহা হইলে মস্তিষ্কবিকারের সহিত তাহার পার্থক্য রহিল কোথায়?' আর এই বুদ্ধির মাপকাটি লইয়া তাঁহারা সন্ন্যাসি-শিরোমণি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও আধুনিক যুগের ত্রৈলিঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী প্রভৃতি আদর্শসন্ন্যাসিগণকে ক্ষিপ্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সন্ন্যাসধর্ম্ম প্রচারের দ্বারা দেশে যতটা অনিষ্ট হইয়াছে এমনটা নাকি বৌদ্ধযুগে কিম্বা মুসলমানআমলেও হয় নাই ইত্যাদি।

আমরা কেবলমাত্র বলিব, "ধন্য কলিযুগ! ধন্য তোমার মোহিনী শক্তি! যাহার প্রভাবে ধর্ম্মপ্রাণহিন্দু আজ ঘোরজড়বাদীতে পরিণত হইয়াছে।"

* * *

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের আভাস আমরা পূর্ব্বে কতক দিয়াছি; এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া আমরা প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

বিপদ্ আসিবে বলিয়া নিচেষ্টভাবে বসিয়া তাহার প্রতীক্ষা করা কিছুমাত্র বুদ্ধিমানের কাজ নহে। গ্রাম্য ভাষায় যাহাকে 'ঘরসামলান' বলে, তাহাই আমরা করিব; তাহাতে অর্থের প্রয়োজন নাই, নিষ্ঠার

প্রয়োজন আছে. বাক্‌চাতুর্য্যের ও বক্তৃতায় প্রয়োজন নাই,কার্য্যের প্রয়োগ আছে। গ্রন্থকার একস্থলে যথার্থই বলিয়াছেন, "চোর চুরি করিবে বলিয়া কি গৃহস্থ নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিবে? উন্মার্গগামী হিন্দু-জাতিকে সতর্ক করিয়া দেওয়া ভিন্ন এই পুস্তকের অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই।

হিন্দু চিরদিনই আধ্যাত্মিক উন্নতিকামী; এই উন্নতির দ্বারা সে একদিন জগতে ধর্ম্মগুরুপদে বৃত হইয়াছিল, জড়বাদ তাহার কাছে চিরদিন কাকবিষ্ঠাস্বরূপ; আবার কিরূপে সে নিজনির্দ্দিষ্ট অধিকার লাভ করিতে পারিবে, তাহার উপায় গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন।

যদি একজনেরও ইহাতে কিঞ্চিৎ উপকার হয়, তাহা হইলে গ্রন্থকার স্বীয় শ্রম সার্থক জ্ঞান করিবেন।

আশা করি, উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হিন্দুসন্তানের নিকট 'বর্ণাশ্রম' মোহমুদ্গর-রূপে প্রতিভাত হইবে। অলমিতি

বিনীত—

শ্রীগিরিজাভূষণ সরকার বি, এ।

সূচীপত্র।

—০—

শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ভূমিকা	১৩	আমায়	আমার
।৵	১৮	রক্ষাতেই	রক্ষাতেই
।।৵	১৫	শেগুণ	সেগুণ
।।৶	২১	নিচেষ্টভাবে	নিশ্চেষ্টভাবে
১	১	যইয়াছে	হইয়াছে
২		র্ম্মধ	ধর্ম্ম
৪	৯	নমস্কার	নমস্কার
৮	২১	প্রভূত্ব	প্রভুত্ব
১২	৮	উদ্ভিজ্জ	উদ্ভিজ্জ
...	২০	চতুর্ধিবব	চতুর্বিধ
১৩	১৫	ময়ূরাদি	ময়ূরাদি
১৮	১৮	ত্যক্তবেদগুণাচার	ত্যক্তবেদস্বগণাচার
২৫	১	ভূস্বর্গও	ভূস্বর্গ ও
২৭	৯	লক্ষ্মণং	লক্ষণং
৩০	১	জন্মা	জন্মান
৩২	১৪	স্ত্রীও	স্ত্রী ও
৩৭	১০	উচ্চারণাদি	উচ্চারণাদি
৩৮	৩	স্থূল	স্থূল
৪২	৫	তজ্জুন্য	তজ্জন্য
৪৩	৩	যোড়শ বর্ষীয়	ষোড়শ বর্ষীয়

৪৫	১৫	বর্ণসঙ্করেব	বর্ণসঙ্করের
৫২	১৫	ব্রাহ্মণস্যোপনয়নম্	ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্
৫৩	১৬	তদাবতীর্য্যাহম্	তদাবতীর্য্যাহং
৫৪	৬	অত্যচারী	অত্যাচারী
৫৬	৯	প্রভূভক্তি	প্রভুভক্তি
৬৩	১৪	ঋগ্ববেদ	ঋগ্বেদ
৬৯	৫	ভাস্করান্দ	ভাস্করানন্দ
৭৩	১৪	উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্য
৭৫	২০	তন্ত্রচতুর্দ্দশোল্লাস	তন্ত্রঃচতুর্দ্দশোল্লাস
৭৬	২২	কথিতম্	কথিতং
৭৯	১৬	বিচার্য্যমানে	বিচার্য্যমাণে
৮০	২	ত্যাজ্য	ত্যজ্য
...	৩	সমুদায়	সমুদয়
৯০	৭	মুর্ত্তির্নৃণাং	মূর্ত্তির্নৃণাং
৯২	২৩	সেব	সেবা
৯৪	২০	কুলাবধূতসংস্কারবিষয়ে	কুলাবধূতসংস্কারবিষয়ে
৯৬	১৪	যা	বা
৯৮	৪	শুশ্রুষা	শুশ্রূষা
১০৬	২	উলঙ্গ	উলঙ্গ
১০৯	১৯	বিষহেদ্	বিসহেদ্
১১২	১	সন্ন্যাসীগণ ও	সন্ন্যাসিগণও
...	১৪	মহাপ্রভূই	মহাপ্রভুই
১১৩	৯	ত্যজেৎ	ত্যজেদ্

বর্ণাশ্রম

প্রথম অধ্যায়।

আজকাল সর্ব্বত্র একটী প্রশ্ন উদয় হইয়াছে যে হিন্দুজাতি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মরূপ গণ্ডিতে আবদ্ধ হইয়াই জাতীয়তা এবং স্বাধীনতা হারাইয়াছে। ছুৎমার্গই তাহার সর্ব্বনাশের কারণ। জাতি বিভাগ কোন দিনই ছিল না এবং কোন দেশেই নাই। উহা কেবল এ দেশের ব্রাহ্মণ জাতির অন্ত জাতি নিষ্পেষণের একটী যন্ত্র মাত্র।

আমরা কিন্তু জানি এইরূপ প্রশ্ন নিরর্থক। কারণ বাদিগণ 'ধর্ম্ম' এবং 'জাতি' শব্দ দ্বারা কি বুঝায় তাহা জ্ঞাত নহেন। তাই তাহারা নানারূপ অকথা কুকথা প্রচার করিয়া সর্ব্বত্র অশান্তি ও অসন্তোষের বীজ বপন করিতেছেন। পূজ্যপাদ মহর্ষি ভরদ্বাজ বলিয়াছেন—"ধারণাৎ ধর্ম্মঃ। অভ্যুদয়করঃ সত্ত্বপ্রাধান্যাৎ। কর্ম্মাবসানে নিঃশ্রেয়সকরঃ শক্তিমত্ত্বাৎ। নিয়ন্তৃত্বাত্তাদ্রূপ্যং ধর্ম্মস্থ।"

"এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ও তাহার অন্তর্গত সমুদয় পদার্থ যিনি ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন তাহারই নাম ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের বলেই জীবজগৎ উন্নতিলাভ করে। কারণ উহা সত্ত্বগুণ বর্দ্ধক। সত্ত্বগুণের চরম অবস্থায় ধর্ম্মের পূর্ণতা লাভ হয়। সুতরাং কর্ম্ম সমুদয় অবসান হইয়া কৈবল্যরূপা মুক্তিকে

লাভ করে। ধর্ম্ম দ্বারাই জগৎ চালিত হয়। সুতরাং ধর্ম্মই ভগবদ্রূপ অর্থাৎ ধর্ম্ম ও ভগবানে কোন ভেদ নাই।”

ধর্ম্ম শব্দটী বহুপ্রকারে ব্যবহৃত হইতে পারে। যথা বর্ণ ধর্ম্ম, আশ্রম র্ম্মধ, রাজধর্ম্ম, প্রজাধর্ম্ম, পুরুষধর্ম্ম, স্ত্রীধর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্ম, মোক্ষধর্ম্ম ইত্যাদি। আমরা উহাকে সাধারণ ধর্ম্ম ও বিশেষ ধর্ম্ম এই দুই নামে বিভক্ত করিব। সাধারণ ধর্ম্ম বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের চর অচর সমুদয় প্রাণীতেই সমান। যেমন স্থূলরূপে আহার নিদ্রাদি। বিশেষ ধর্ম্ম প্রত্যেক বস্তু, ব্যক্তি, জাতি, গুণ এবং ক্রিয়াদিতে বিভিন্ন। স্থাবর ও জঙ্গম ভেদে প্রাণী দুই প্রকার। তাহারা উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ এবং জরায়ুজ এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। ধর্ম্মের এমন শক্তি আছে যে তদ্দ্বারা এক বস্তুকে অন্য বস্তুতে আনয়ন করে। অন্যে ইহাকেই ক্রমোন্নতি বাদ বলেন। উদ্ভিজ্জ যোনিতে এক মাত্র অন্নময় কোষ বর্ত্তমান। তাহাতে আর চারিটী কোষের অস্তিত্ব শাস্ত্র-যুক্তি দ্বারা স্থূলতঃ সিদ্ধ হয় না। কারণ তাহাতে প্রাণ মনের ধর্ম্ম কিছুই লক্ষিত হয় না। অন্নময় হইতে প্রাণময় কোষ শ্রেষ্ঠ, তজ্জন্য উদ্ভিজ্জ প্রাণী সমুদয় তাহাদের কর্ম্মক্ষয়ে স্বেদজ প্রাণীতে উন্নত হয় এইরূপ বলা যায়। কারণ তাহাদের প্রাণময় কোষের ক্রিয়া চলনাদি ধর্ম্ম বর্ত্তমান আছে। স্বেদজ প্রাণী হইতে জীব উন্নত হইয়া অণ্ডজ প্রাণীতে জন্মগ্রহণ করে। উহাতে অন্নময়, প্রাণময় এবং মনোময় এই তিনটী কোষ বর্ত্তমান আছে। তদনন্তর অন্তর্নিহিত ধর্ম্মশক্তির বলে জীব অণ্ডজ হইতে জরায়ুজ যোনিতে নীত হয় এবং অন্ন, প্রাণ, মন ও বিজ্ঞানময় কোষ চতুষ্টয় লাভ করে। সর্ব্ব শেষে ঐ ধর্ম্মশক্তি তাহাকে মনুষ্য যোনিতে উন্নীত করে এবং অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান, ও আনন্দময় এই পঞ্চকোষ সমন্বিত দেহ প্রদান করে। এই পঞ্চকোষ মনুষ্যেই লক্ষিত হয়। এই পঞ্চ কোষ বর্ত্তমান থাকায় মনুষ্য অন্য প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ। তজ্জন্য তাহার ভাল, মন্দ, পাপ, পুণ্য

বিচার করিবার শক্তি এবং ভোগের ক্ষমতা আছে। মনুষ্যেতর অন্য যোনিতে দেহ সত্বেও প্রকৃতির বাহিরে যাইবার ক্ষমতা কাহারও নাই। কর্ম্মফলে প্রকৃতির অধীনতায় পতিত হইলে প্রকৃতি জীবকে ক্রমশঃ উন্নতির মার্গে আরোহণ করাইয়া মনুষ্য যোনি পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দেয়। তারপর সে নিজের কর্ম্মানুযায়ী উন্নত বা অবনত হয়। মনুষ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া ইচ্ছাশক্তির বলে নিজ নিজ ভোগস্থান যথেচ্ছ বাড়াইয়া লইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতির রাজত্বে অন্য কাহারও সে প্রকার ক্ষমতা নাই তাহা সর্ব্বদাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। পশুপক্ষী আদির আহার নিদ্রাদি ধর্ম্ম সমুদয় নিয়মিত কিন্তু মানুষের তাহা নহে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ ব্যাপার। সেইজন্য পশুপক্ষী আদি ক্রমাগত উন্নত হইয়া মনুষ্য যোনি পর্য্যন্ত যায় এবং মনুষ্য হইতে সদসৎ কর্ম্ম দ্বারা উচ্চ বা নীচ গতিতে ঊর্দ্ধে বা নিম্নে গমন করে। যদি শাস্ত্র যুক্তি কিংবা সদ্‌গুরুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া অথবা রাজদণ্ডভয়ে আপনার মনোবৃত্তি সংযত করতঃ উত্তম কর্ম্ম সম্পাদন করে তাহা হইলে মনুষ্য ক্রমশঃ অসভ্য জাতি হইতে সভ্য জাতি, নীচ চণ্ডালাদি জাতি হইতে শূদ্র জাতি, শূদ্র হইতে বৈশ্য, বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ জাতিতে গমন করে। ইহা তাহার জন্মান্তরেই সম্ভব, এইরূপ শাস্ত্রকারগণ বলিয়া থাকেন। ক্রমশঃ মনুষ্য সত্বগুণ বৃদ্ধি করতঃ শাস্ত্রজ্ঞ, বেদজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া মুক্তিপদ লাভ করে। যথা :—

"যোগাভ্যাসো নৃণাং যেষাং নাস্তি জন্মান্তরাদৃতঃ।
যোগস্য প্রাপ্তয়ে তেষাং শূদ্র বৈশ্যাদিক ক্রমঃ॥
স্ত্রীত্বাচ্ছূদ্রত্বমভ্যেতি ততো বৈশ্যত্বমাপ্নুয়াৎ।
ততশ্চ ক্ষত্রিয়ো বিপ্রঃ ক্রপাহীন স্ততো ভবেৎ॥

অনুচানঃ স্মৃতো যজ্বা কর্ম্মন্যাসী ততঃপরং।
ততো জ্ঞানিত্বমভ্যেতি যোগী মুক্তিং ক্রমাল্লভেৎ” ॥

মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব।

ইহাই সাধারণ ধর্ম্ম।

বিশেষ ধর্ম্ম সম্বন্ধে মহাভারত বলেন—

“যং পৃথগ্ ধর্ম্মচরণাঃ পৃথগ্‌ধর্ম্মফলৈষিণঃ।
পৃথগ্‌ধর্ম্মৈঃ সমর্চ্চন্তি তস্মৈ ধর্ম্মাত্মনে নমঃ ॥”

“পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মফল কামনা করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম লোকে আচরণ করিয়া থাকে। সেই ধর্ম্মরূপী ভগবান্‌কে নমস্কার।” মহাভারতের এই বাক্য দ্বারা বুঝা যায় যে পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি বা জাতির নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মের উপদেশ হয় এবং সাধারণ ধর্ম্ম হইতে বিশেষ ধর্ম্মের বিশিষ্টতা স্বতন্ত্র। তজ্জন্য স্ত্রী পুরুষ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না বা পুরুষ স্ত্রীধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না। রাজা প্রজার ধর্ম্ম গ্রহণ করে না বা প্রজা রাজার ধর্ম্ম পালনে সমর্থ হয় না। সন্ন্যাসী গৃহীর ধর্ম্ম গ্রহণ করে না বা গৃহী সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম গ্রহণ করে না। মোট কথা কেহই নিজের স্বতন্ত্রতা ত্যাগ করিতে পারে না। যদি কেহ সেই স্বতন্ত্রতা সাম্যবাদের ভানে নষ্ট করিতে চায় তবে তাহার অস্তিত্ব লোপই একমাত্র ফল হইয়া দাঁড়াইবে তাহা পরে দেখান যাইতেছে।

শাস্ত্রোক্ত সাধারণ ধর্ম্ম দশটী যথা—

“ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধী বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥”

"ধৃতি, ক্ষমা, দম, অচৌর্য্য, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ এই দশটী সাধারণ ধর্ম্ম অর্থাৎ মনুষ্য মাত্রই ইহার অধিকারী।" সমুদয় লোকই ইহার অনুষ্ঠান করিতে পারেন কিন্তু পাত্র বিশেষে ফল প্রত্যেক স্থানেই বিভিন্ন হইবে। কারণ বৃষ্টি সমান ভাবে সর্ব্বত্র হইলেও উচ্চ ভূমিতে জল দাড়াইতে পারে না কিন্তু নিম্ন ভূমি সমুদয় পূর্ণ হইয়া যায়।

পতিপরায়ণা সতী স্ত্রী আপন ভোগ বিলাস তুচ্ছ করিয়া অসীম ধৈর্য্য সহকারে জ্বলন্ত অনলে স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন করে। সতীর ধৈর্য্যের সহিত শিশুর প্রতিপালন নিমিত্ত মাতার যে ধৈর্য্য তাহার তুলনা হয় না। একজন ক্ষত্রিয় নানাপ্রকারে আহত হইয়াও রণক্ষেত্র হইতে অপসৃত হয় না। তাহার ধীরতার সহিত শীতাতপ সহনশীল তপস্বী ব্রাহ্মণের ধীরতা তুলনা করা যায় না। চোর ডাকাইত প্রভৃতি শাসনের সময় রাজা যদি ক্ষমা গুণের আশ্রয় লয়, তাহার রাজত্ব অচিরাৎ বিনাশ পায় কিন্তু সর্ব্ব ত্যাগী সন্ন্যাসীর নিকট ক্ষমা সর্ব্বাবস্থাতেই সম্ভবপর। একজন বান-প্রস্থাশ্রমী তপস্বীর তপঃসাধনের নিমিত্ত যতটা দম বৃত্তি আবশ্যক, রাজ্য শাসন রত রাজার নিকট তাহার বিপরীত হওয়াই বাঞ্ছনীয় নতুবা উচ্ছৃঙ্খলতায় দেশ উৎসন্ন যায়। যতিধর্ম্মপরায়ণ সাধুর ইন্দ্রিয় নিগ্রহের সহিত গৃহধর্ম্মীর ইন্দ্রিয় নিগ্রহ তুলনার যোগ্য নহে। সুস্থ বলিষ্ঠ ব্যক্তির শৌচাচারের সহিত আপদ্‌গ্রস্ত রোগী অথবা ব্রত নিরত ব্রাহ্মণের শৌচ তুলনা করা যায় না। এই সমুদয় দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে সাধারণ ধর্ম্মগুলিই বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সংশ্রবে বিশেষ বিশেষ আকার ধারণ করে। এই বিশিষ্টতাতেই জগতের স্থিতি এবং পুষ্টি। তজ্জন্য যতদিন জগৎ দৃষ্টিপথ গোচর হইবে ততদিন ইহার প্রত্যেক ব্যক্তির বা জাতির স্বীয় বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে;

নতুবা তাহার অস্তিত্ব রক্ষা করা বা উন্নতি করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অন্যান্য দেশে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এই বিশিষ্টতা নাই। তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তির পৃথক্ পৃথক্ চরিত্র, অবস্থা বা সাধনার তারতম্য নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উন্নতির পথে কণ্টক রোপন করিতেছেন। সমগ্র ইউরোপ আজ পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াও দিন রাত অশান্তির অনলে জ্বলিয়া মরিতেছে। বলসেভিকবাদ কিরূপ ভীষণতা ধারণ করিয়াছে তাহা বর্ণনার অযোগ্য। কর্ম্মে, ব্যবহারে, রাজনীতি ক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই এই বিশিষ্টতা তাহাদের ভিতরও লক্ষিত হয় কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রায় সকলেই অন্ধ।

রাজনীতি ক্ষেত্রে গ্লাড্‌ষ্টোনের মত মন্ত্রী না লইয়া যদি রামা শ্যামা কাহাকেও নিযুক্ত করা হইত, তাহার ফলে কি দেশ শাসন সম্ভবপর হইত? ফল কথা স্ত্রীজাতি এক হইলেও মায়ের সহিত যে সম্বন্ধ ভগ্নীর সহিত তাহা নাই বা ভগ্নীর সহিত যে সম্বন্ধ তাহা স্ত্রীর সহিত হইতে পারে না। সতীর পতির সহিত যে সম্বন্ধ তাহা পিতা, পুত্র বা ভ্রাতার সহিত হইতে পারে না। এই সম্বন্ধগুলির সামঞ্জস্য রাখিয়া যাহাতে তাহার প্রকৃত অবস্থা লাভ হয় তাহারই ব্যবস্থা করা হিন্দু শাস্ত্রের মৌলিকত্ব; এবং এই মৌলিকত্ব এখনও সম্পূর্ণ যায় নাই বলিয়া আর্য্যজাতির বিশেষত্ব কতকটা বর্ত্তমান আছে। পৃথিবীর ইতিহাসে পাওয়া যায় যে আরও অনেক জাতি ছিল যাহারা কালে লোপ পাইয়াছে অথবা অন্য জাতিতে পরিণত হইয়াছে কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্ম্মরূপ ভিত্তির উপরে দণ্ডায়মান এই অতি পুরাতন জাতি জীর্ণ শীর্ণ কলেবরে শত আঘাত খাইয়া এখনও বিরাজমান রহিয়াছে। বৈদিকধর্ম্মে সাধারণধর্ম্মের সমুদয়গুলি বর্ত্তমান আছে, বিশেষ ধর্ম্মের বিশিষ্টতাও আছে, তাহা ছাড়া অসাধারণ ধর্ম্ম প্রভাবে একই জন্মে জাতিত্বকে ব্যক্তিত্বের প্রবল শক্তি পরাস্ত করিয়াছে

তদ্রূপ দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। অন্য জাতিতে এই সমুদয় না থাকায় মুখ্যরূপে অধিকার বা অধিকারীর ভেদ, স্বর্গ, নরক, মুক্তাবস্থায় ভেদ, নর নারীর প্রকৃতি এবং কর্ম্মভেদ বা আচারাদির ভেদ, কিছুই লক্ষিত হয় না। তাই আমরা তথা কথিত সাম্যবাদিগণ হইতে পৃথক্ রহিয়াছি। রোগী, দুর্ব্বল, দুর্ভিক্ষ পীড়িত অথবা সবল, ব্যায়ামশীল এবং নিয়মিত ভোজী প্রত্যেকেরই নিমিত্ত যদি পায়সান্ন বা বার্লির ব্যবস্থা করা যায় তাহাতে যেমন ব্যবস্থা কর্ত্তা হাস্যাস্পদ হন, এবং ভোক্তার তৃপ্তি বা বল কিছুই বর্দ্ধিত হয় না তদ্রূপ সাম্যবাদের ধূয়ায়, জাতি, আশ্রম বা বর্ণ সমুদয় একাকার করিলে কাহারও কিছু উন্নতি হয় না বরং সর্ব্বনাশের কারণই হইয়া থাকে। তজ্জন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই স্বাভাবিক ও প্রকৃতির অনুকূল। যাহারা প্রকৃতির সত্তা এবং তাহার ক্রিয়াদি অনুধাবন করেন না, তাহাদের মুখে এতাদৃশ উক্তি সম্ভব হইলেও বুদ্ধিমান্ ও আত্মসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ তাহা মানিতে পারেন না। পুরুষ, নারী, রাজা, প্রজা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি প্রত্যেকেরই বিশিষ্টতা আছে সুতরাং সেই বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া তাহাকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে হইবে। মনুষ্য সমাজের রীতি নীতি আলোচনা করিলে স্বতঃই প্রতীয়মান হয় যে যদি প্রত্যেক সমাজেই ব্যক্তি বিশেষে স্বীয় বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া না চলে, যদি কতকগুলি লোক কৃষি বাণিজ্য, কতকগুলি লোক কুলি ইত্যাদির কাজ, কতকগুলি লোক যুদ্ধ বিগ্রহ এবং কতকগুলি আধ্যাত্মিক উন্নতি বা উপদেশাদির চেষ্টা না করে তাহা হইলে সে সমাজ বা জাতি ক্রমশঃ অবনত হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। তজ্জন্য সব দেশে এইরূপ ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের সেগুলি প্রায় স্বেচ্ছাগত বা অর্থগত, আমাদের দেশে সেগুলি জন্মগত ছিল ইহাই প্রভেদ। ক্ষত্রিয় জাতির ধর্ম্ম রজঃ সত্ত্ব প্রধান, তজ্জন্য তিরস্কার পুরস্কার ইত্যাদি দ্বারা যদি প্রজাপালন এবং

স্বধর্ম্মে অনুশীলন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ জাতির সত্ব প্রধান কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে ক্ষত্রিয় জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী। কারণ ক্ষত্রিয় রাজা যদি ঐ সমুদয় রাজ্য রক্ষাদি রূপ ধর্ম্ম ত্যাগ করতঃ ব্রাহ্মণ জাতির ন্যায় অধ্যাত্ম উন্নতির চেষ্টা করে এবং তজ্জন্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে তাহা হইলে শাসন কর্ত্তা বিহীন হওয়ায় দেশে প্রবলের অত্যাচারে দুর্ব্বল পীড়িত হইতে থাকে ; দুষ্ট সমুদয় একত্রিত হইয়া সৎকার্য্য সমুদয় সমূলে উৎপাটিত করে ; সুতরাং স্বল্পকাল মধ্যেই রাজ্য এবং রাজা দুইই সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

পূর্ব্ব জন্মাভ্যস্ত কর্ম্মসমূদয়ের ভোগনিবৃত্তি বা পুষ্টির নিমিত্ত দেহ ধারণ করা জীবের ধর্ম্ম। সন্ন্যাস আশ্রমে কর্ম্মনিবৃত্তির নিমিত্ত সম্যক্ সাধনা অনুষ্ঠিত হয়। গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবৃত্তির সম্যক্ পুষ্টি করতঃ নিবৃত্তির পথে উন্নত হইবার জন্য নিয়মাদি অনুষ্ঠিত হয়। তজ্জন্য নিজের জন্য কিছু সঞ্চয় না করা, সর্ব্বদা অধ্যাত্ম চিন্তা, শাস্ত্রাদি অনুশীলন এবং তাহার গতি দ্বারা লোক হিতকর কর্ম্মের বৃদ্ধি, এই কয়টী সন্ন্যাস আশ্রমের কাজ ; এবং অর্থ সঞ্চয়, পরিবার বর্গের ভরণ পোষণ, যাগ যজ্ঞাদি দ্বারা দেব পিতৃ মানবাদির তৃপ্তি সাধন ও অবসর মত অধ্যাত্ম চিন্তা প্রবৃত্তি-মার্গাবলম্বী গৃহস্থের নিত্য কার্য্য। এখন যদি কেহ সন্ন্যাসী হইয়া গৃহীর ধর্ম্ম পালন করিতে যায় সে যেরূপ ব্রহ্ম ও কর্ম্ম উভয় মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং অন্যেরও অধঃপতনের কারণ হয়, তদ্রূপ গৃহীও সন্ন্যাসীর অনুষ্ঠেয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে যাইয়া কর্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয়ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। ইহলোকে মান যশ প্রভুত্ব প্রভৃতির কামনা পরায়ণ জীবই ক্ষত্রিয় কুলে জন্মগ্রহণ করে এবং পরলোকে উন্নতিকামী অথবা জ্ঞান-লাভেচ্ছু ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ কুলে জাত হয় ইহাই সাধারণ বা প্রাকৃতিক নিয়ম। বিশ্বামিত্রের মত অসাধারণ ব্যক্তি দ্বারা এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম

হইয়াছে কিন্তু তাহাও বিশেষ ধর্ম্মের অনুগামী ইহা পরে দেখান যাইতেছে।

বর্ণধর্ম্ম কি ? জাতীয় উন্নতির সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ আছে কি না ? ইহা অনাদি কাল হইতে প্রচলিত অথবা ব্রাহ্মণ জাতির স্বকপোল-কল্পিত কোন কিছু ? বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষণীয় অথবা ইহার ধ্বংসই প্রার্থনীয় ? বর্ণ-সঙ্কর হইলে কি দোষ হইতে পারে ইত্যাদি বিষয়গুলির সম্যক্ বিচার অতঃপর করা যাইতেছে।

কোন বস্তুর লাভ বা লোকসান্ বিচার করিতে হইলে প্রথমে সেই বস্তুর অস্তিত্ব বা নাশ কোন্ সত্তায় অবস্থান করে অর্থাৎ দৃশ্যমান্ প্রকৃতির সহিত তাহার মৌলিক কোন সম্বন্ধ আছে কি না তাহা সর্ব্ব প্রথমে বিচার্য্য। কারণ প্রকৃতির সহিত তাহার মৌলিকত্ব রূপ সম্বন্ধ নির্ণীত হইলে প্রকৃতির অবস্থান পর্য্যন্ত তাহার অবস্থানসম্ভব হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তৎপরে বিচার করিতে হইবে যে উহা দ্বারা আমরা কতটুকু লাভ বা লোকসানের ভাগী হইব এবং কিরূপে ব্যবহার করিলে তাহা আমাদের স্বার্থ সিদ্ধির সহায়ক হইতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্ব অবগত আছেন তাঁহারা বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা স্বকপোল-কল্পিত বলিতে সাহসী হন না। যাঁহারা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির ক্রিয়া কলাপ নিবিষ্ট চিত্তে অধ্যয়ন করিতে সমর্থ এমন ধীর মস্তিষ্ক ব্যক্তিগণ প্রকৃতির সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রকৃতির ভাগ অনুযায়ী উদ্ভিজ্জ হইতে আরম্ভ করিয়া দেবতা পর্য্যন্ত সমুদয় জীবের গুণ-তারতম্য অবলোকন করিয়া বর্ণধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যদি প্রকৃতিতে কেবল মাত্র সত্ত্ব কিংবা রজঃ বা তমোগুণ বর্ত্তমান থাকিত তাহা হইলে একই বর্ণ উৎপন্ন হইত। যদি কোন দুইটী গুণ বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে তিনটী বর্ণের উৎপত্তি হইতে পারিত। কিন্তু

দুর্ভাগ্য ক্রমে তিনটী গুণের বিকাশ থাকায় মূল চারিটী বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে এবং মিশ্রণ ফলে আরও বহু বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। সৃষ্টি ধারা আরোহিণী ও অবরোহিণী ভেদে দ্বিবিধ। একটী তমোগুণ হইতে সত্ত্ব গুণে লইয়া যায়, অপরটী সত্ত্বগুণ হইতে তমোগুণে আনয়ন করে। প্রথমটী হইতে পিণ্ডরূপ দেহের উৎপত্তি এবং দ্বিতীয়টী হইতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রথম প্রকারে তমোগুণ হইতে উন্নতি দ্বারা তমো রজোগুণে মিলিত হয়। পরে রজঃ সত্ত্বে মিলিত হয় এবং অবশেষে সত্ত্ব গুণে উপনীত হয়। প্রকৃতির এই প্রধান চারি বিভাগ জন্য চারি বর্ণরূপ শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। তিন গুণের সংমিশ্রণ দ্বারা চারিটী বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে ; সুতরাং উহার সত্তা প্রকৃতির সত্তায় অবস্থিত এবং প্রকৃতি অনাদি বলিয়া বর্ণও অনাদি। তজ্জন্যই এই বর্ণ ব্যবস্থা কাহারও কৃত নহে।

ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি কালে গুণ ক্ষোভ বশতঃ সত্ত্বগুণ হইতে সত্ত্ব রজোগুণে— সত্ত্ব রজ হইতে রজোগুণে * রজ হইতে রজস্তমো গুণ এবং রজস্তম হইতে তমোগুণে উপনীত হয় ; তজ্জন্যই সত্যযুগ প্রারম্ভে একমাত্র ব্রাহ্মণ বর্ণ ছিল, পরে কালক্রমে অন্যান্য বর্ণ সমুদয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। তজ্জন্যই এই বর্ণ ব্যবস্থা প্রকৃতির প্রতি অণু-পরমাণুতে গ্রথিত। ব্যষ্টি ও সমষ্টি এই উভয় প্রকার সৃষ্টিতেই একই তত্ত্ব পাওয়া যায়। ব্যষ্টি সৃষ্টির অপর নাম জীব সৃষ্টি। যদিও জীব অনাদি কাল হইতে বর্ত্তমান তথাপি যে সময় প্রকৃতি পুরুষের সম্বন্ধ বশতঃ নূতন ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয় তখনই জীবের কারণশরীর সমুদয় সৃষ্ট হয় এবং ঐ কারণ শরীর হইতে সূক্ষ্ম শরীর রূপী সপ্তদশ অবয়ব কারণশরীরে অবস্থিত হয়। তদনন্তর প্রকৃতির স্থূলত্ব

---

* শুধু ক্রিয়াশীলতা থাকায় রজোগুণ একক কোন কাজ করিতে সক্ষম হয় না। ধারণ ও পোষণ ক্ষমতা ভিন্ন ক্রিয়াশীলতার ফল বৃথা।

হইয়া ভোগায়তন স্থূল দেহের উৎপত্তি হইয়া থাকে। প্রকৃতি স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন ভাগে বিভক্তা। তাই জীবেরও স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ ত্রিবিধ দেহ আছে জানা যায়। তমঃ, রজঃ এবং সত্ত্ব এই তিন গুণ হইতে প্রকৃতির অনুযায়ী স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ উৎপন্ন হয়। তজ্জন্য বর্ণধর্ম্ম স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ তিন দেহ লইয়াই বর্ত্তমান আছে। কিন্তু যাঁহারা স্থূল শরীর পরিত্যাগ করতঃ সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরেই বর্ণ-ধর্ম্ম অবস্থিত বলেন তাঁহারা ভ্রান্ত। তাঁহাদের বিচার শক্তি সাধারণ বুদ্ধি জাত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ তিন দেহ ও চৈতন্যের মিলনের নাম জীবাবস্থা। সুতরাং পঞ্চ ভূতের উৎপন্ন স্থূল দেহ বাদ দিয়া বর্ণত্ব শুধু সূক্ষ্ম ও কারণ দেহের উন্নতি দ্বারা সম্ভব, ইহা অপসিদ্ধান্ত। প্রকৃতির বেগ ধারা অবলম্বন করিয়াই জীব উন্নত বা অবনত হয়। তাহার বিপরীত হওয়া কাহারও সাধ্য নাই। শাস্ত্র দৃষ্টিতে জানা যায় চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করতঃ জীব মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হয়। আমরা যদিও ইহা প্রমাণ করিতে পারি না, তথাপি শাস্ত্র অভ্রান্ত স্বীকার করি তাই মানিয়া লই। মতভেদে ইহা অস্বীকার করিতে হইলেও উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ এই চারি যোনিতে জীবের উৎপত্তি হয় এ সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই। স্থূল শরীর পরিবর্ত্তনের সহিত সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হয় এবং ক্রমশঃ সত্ত্ব গুণের দিকে অগ্রসর হয় ইহা প্রকৃতির ক্রিয়ানুযায়ী হইয়া থাকে। যেমন নদী স্রোতে পতিত বস্তুকে তাহার প্রবাহ অনুযায়ী ভাসাইয়া লইয়া যায় তেমনই প্রকৃতি আরোহিণী গতিতে জীবকে ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর করে এবং অবরোহিণী গতিতে নিম্নস্তরে পৌছাইয়া দেয়। অন্য যোনিতে অবস্থান কালে নূতন পাপ বা পুণ্য কিছুই সঞ্চিত হয় না। কারণ তখন জীবের সমুদয় সংস্কার প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া সমষ্টি সংস্কার রূপে দৃষ্ট হয়। তজ্জন্য সিংহ ব্যাঘ্রাদি অজস্র হিংসা করিয়াও পাপের ভাগী হয় না বা লতা পাতা খাইয়া গবাদি পশুও পুণ্যাত্মা হয় না। মনুষ্য যোনিতে যদ্রূপ গুণত্রয়ের বিভাগ অনুযায়ী চতুর্ব্বিধ বর্ণ দৃষ্ট হয়, বৈদিক শাস্ত্রানুযায়ী এবং যুক্তি অনুযায়ী অন্যান্য যোনিতেও তদ্রূপ চতুর্ব্বিধ বর্ণ দৃষ্ট হয়;

উদ্ভিজ্জ প্রাণীর মধ্যে বৃক্ষ শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে অশ্বত্থকে ব্রাহ্মণ আখ্যায় অভিহিত করা হয়। গীতায় উক্ত হইয়াছে—'অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাম্', অর্থাৎ সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে আমিই অশ্বত্থ। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ অশ্বত্থ বৃক্ষ প্রতিষ্ঠার ফল নানারূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন। অশ্বত্থ বৃক্ষের ন্যায় বট বিল্বাদি ব্রাহ্মণ শ্রেণীর অন্তর্গত। শাল সেগুণ আদি বৃক্ষ ক্ষত্রিয় শ্রেণীর অন্তর্গত; আম কাঁঠাল আদি বৈশ্য শ্রেণীর অন্তর্গত এবং বাঁশ, ওষধি প্রভৃতি শূদ্র শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া ভাগ করা হইয়াছে। স্বেদজ প্রাণীর ভিতর পুষ্পাদিতে যাহারা জন্মগ্রহণ করে, মধু আদি পান করে তাহারা ব্রাহ্মণ শ্রেণীর অন্তর্গত। রক্ত হইতে উৎপন্ন পরস্পর বিবাদ-রত কীটগুলি ক্ষত্রিয় শ্রেণীর অন্তর্গত এবং লাক্ষা ইত্যাদির উৎপত্তি-কারক বৈশ্য শ্রেণীর অন্তর্গত ও বিষ্ঠাদির কীটগুলি শূদ্র শ্রেণীর অন্তর্গত। বেদান্ত শাস্ত্র বলেন অণ্ডজ প্রাণীর মনোময় কোষ বর্ত্তমান আছে তজ্জন্য মনোধর্ম্ম প্রেমাদি যাহাতে অধিকতর পরিলক্ষিত হয় তাহারা ব্রাহ্মণ জাতির অন্তর্গত। যেমন কপোত, চকোর ইত্যাদি। বাজ আদি শিকারী পক্ষী ক্ষত্রিয় জাতির অন্তর্গত। ময়ূরাদি পক্ষী বৈশ্য জাতির অন্তর্গত এবং কাক গৃধ্র আদি পক্ষী শূদ্র জাতির অন্তর্গত। যাহাদের ফলিত জ্যোতিষে জ্ঞান আছে তাঁহারা এই সব উত্তমরূপে ধারণা করিতে পারেন। অনেকে বলেন বেদ ভিন্ন আমরা অন্য কিছু বিশ্বাস করি না কিন্তু যাহা তাঁহাদের মনোমত হয় না বা ধারণায় কুলায় না তাহাকে হয় প্রক্ষিপ্ত না হয় রূপক বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন। প্রক্ষিপ্ত বলিলে তাহার প্রমাণ দিতে হইবে ইহা কিন্তু তাঁহাদের সামর্থ্যের বাহিরে; রূপক শব্দের অর্থ কি তাহা তাঁহাদের জ্ঞানের বাহিরে। কারণ দুইটী সত্য বস্তু থাকিলে তবে একটী রূপক হয়। অসত্য বস্তুতে রূপক সিদ্ধ হয় না। যাই হোক্ তৈত্তিরীয় সংহিতা আমাদের কথা প্রমাণিত

করিতেছেন তজ্জন্য তাহা হইতে কিছু এখানে উল্লেখ করা যাইবে। "প্রজাপতির কাময়ত প্রজায়েয়েতি স মুখতস্ত্রিবৃতং নিরমিমীত তমগ্নির্দেবতা অন্ব স্বজত......ব্রাহ্মণো মনুষ্যানামজঃ পশূনাং তস্মাত্তেমুখ্যাঃ, বাহুভ্যাং পঞ্চদশং নিরমিমীত তমিন্দ্রো দেবতা অন্বস্বজ্যত......রাজন্যো মনুষ্যানামবিঃ পশূনাং তস্মাত্তে বীর্য্যবন্তো......মধ্যতঃ সপ্তদশং নিরমিমীত তং বিশ্বেদেবা দেবতা অন্বস্বজ্যন্ত .....বৈশ্যো মনুষ্যানাং গাবঃ পশূনাম্ ......সোঽন্যেভ্যো ভূয়িষ্ঠা হি দেবতা অন্বস্বজ্যন্ত শূদ্রো মনুষ্যানামশ্বঃ পশূনাম্......। প্রজাপতি স্বষ্টি করিবার ইচ্ছা করিয়া মুখ হইতে তিন প্রকার স্বষ্টি করিলেন তাহারা ব্রাহ্মণ বর্ণের, যথা দেবতা দিগের মধ্যে অগ্নি, মনুষ্য মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং পশু মধ্যে ছাগ। বাহু হইতে যাহারা উৎপন্ন হইলেন তাহারা ক্ষত্রিয়বর্ণ নামে অভিহিত, যেমন দেবমধ্যে ইন্দ্র, মনুষ্য মধ্যে ক্ষত্রিয় এবং পশু মধ্যে ভেড়া। মধ্য হইতে যাহারা উৎপন্ন হইলেন তাহারা বৈশ্য, দেবতাদিগের মধ্যে বিশ্বদেবগণ, মনুষ্য মধ্যে বৈশ্য জাতি এবং পশুমধ্যে গরু। পদ হইতে যাহারা উৎপন্ন হইলেন তাঁহারা শূদ্রবর্ণ, তাহার মধ্যে অনেক দেবতাও মনুষ্য এবং পশু মধ্যে অশ্ব পরিগণিত হইল। বেদে উপনিষদে বহু স্থানেই এইরূপ সর্ব্ব প্রাণীর মধ্যেই প্রকৃতির তিন ধারা অবলম্বন করিয়া চারি বর্ণের উৎপত্তি লিখিত হইয়াছে। যাঁহারা এ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিতে চান তাঁহারা যেন সর্ব্ববর্ণাশ্রম নাশকারী বৌদ্ধগণকে যিনি সমূলে উৎপাটন করেন সেই ব্রাহ্মণবর্য্য কুমারিলকৃতমীমাংসাতন্ত্র বার্ত্তিক, শ্লোক বার্ত্তিক প্রভৃতি গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করেন তাহা হইলে তাঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধির দৌড় বুঝিতে পারিবেন এবং তর্ক বুদ্ধির পরিণাম কোথায় তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। দিগ্‌দর্শনের ন্যায় আমরা সামান্যই কিছু উল্লেখ করিতেছি। অন্যান্য যোনিতে বুদ্ধির বিকাশ না হওয়াতে এবং অভিমান অহঙ্কারাদি বৃত্তি পুষ্ট না হওয়াতে প্রকৃতির

বিরুদ্ধ কোন কাজই করিবার ক্ষমতা থাকে না। সুতরাং আহার নিদ্রা মৈথুনাদি ধর্ম্ম প্রকৃতির ক্রিয়ানুযায়ী হইয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্য যোনিতে অহঙ্কারের পূর্ণতা হওয়াতে তাহার বিরুদ্ধাচরণে সামর্থ্য জন্মে। তজ্জন্য মানুষ আহার নিদ্রাদি বিষয়ে সম্পূর্ণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে। সেই উচ্ছৃঙ্খলতা রোধের নিমিত্ত ঋষিগণ বর্ণ ধর্ম্ম নির্ণয় করিয়াছেন এবং তাহা হইতে উন্নত জীবের ত্রিবিধ শরীরের পুষ্টি সাধনান্তর ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য আশ্রম ধর্ম্মরূপ নিবৃত্তি ধর্ম্মের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। তজ্জন্য ঋষি-প্রণীত বা বেদাদি সমুদয় শাস্ত্রে এক বাক্যে এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আবশ্যকতা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যোগদর্শনকার মহর্ষি পতঞ্জলি যুক্তি দ্বারা ইহার সার্থকতা প্রমাণ করিয়াছেন। যথা -

'ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্ট-জন্ম-বেদনীয়ঃ সতিমূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ "ক্লেশমূলক কর্ম্মাশয় দুই প্রকার দৃষ্ট-জন্ম-বেদনীয় ও অদৃষ্ট-জন্ম-বেদনীয়। তাহার মধ্যে পুণ্য ও অপুণ্যাত্মক কর্ম্মাশয় কাম, লোভ, মোহ ও ক্রোধ হইতে প্রসূত হয়। তাহা দৃষ্ট জন্ম বেদনীয় ও অদৃষ্ট জন্ম বেদনীয় ভেদে আবার দ্বিবিধ। তীব্র বৈরাগ্যের সহিত আচরিত মন্ত্র, তপ ও সমাধির অথবা ঈশ্বর, দেবতা বা মহানুভব ব্যক্তির আরাধনা দ্বারা উৎপন্ন পুণ্যের ফল সদ্যই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেইরূপ তীব্র অবিদ্যাদিগ্রস্ত হইয়া ভীত, বাধিত, দীন, শরণাগত বা মহানুভব তপস্বী-গণের প্রতি পুনঃ পুনঃ অপকার করিলে যে পাপ কর্ম্মাশয় হয় তাহার সদ্যই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেমন বালক নন্দীশ্বর মনুষ্য পরিণাম ত্যাগ করিয়া তজ্জন্মেই দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এবং সুরেন্দ্র নহুষ দৈব পরিণাম ত্যাগ করতঃ তির্য্যক্ জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে নারক গণের দৃষ্ট জন্ম বেদনীয় সংস্কার নাই এবং ক্ষীণ ক্লেশ পুরুষের অদৃষ্ট জন্ম বেদনীয় কর্ম্মাশয় নাই।

মূলে এই ক্লেশ বর্ত্তমান থাকায় কর্ম্মাশয় ফলারম্ভী হয়। যতদিন তণ্ডুল তুষবদ্ধ থাকে এবং বীজ ভাব দগ্ধ না হয় ততদিনই তাহা দ্বারা নূতন ধান্যের উৎপত্তি সম্ভব। কিন্তু ঐ বীজ দগ্ধ ভাব প্রাপ্ত হইলে আর কিছু উৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না। সেই কর্ম্মাশয়ের বিপাক ত্রিবিধ ; জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ। প্রশ্ন হইতে পারে জাতি, আয়ুঃ ও ভোগের কারণ কি ? তিন প্রকার কারণ মনুষ্য পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে। (১) ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব উহার কারণ। (২) উহার কারণ অজ্ঞেয়। (৩) কর্ম্ম উহার কারণ। ঈশ্বর উহার কারণ ইহা যুক্তিসহ নহে, উহা শুধু বিশ্বাসের কথা। তাঁহাদের মতে ঈশ্বরও অজ্ঞেয় ; সুতরাং উহার কারণও অজ্ঞেয়। দ্বিতীয় মত অজ্ঞেয় বাদীদের নিকট অজ্ঞেয় হইলেও উহা অজ্ঞেয় ইহা সঙ্গত নহে। সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মই ইহার কারণ ইহাই যুক্ততম। এই কর্ম্ম ভাষ্যকার যেরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার এ স্থলে সম্পূর্ণ বিচার করা অসম্ভব। তবে মোটামুটী ইহাই বলা যায় যে অনেক কর্ম্মাশয় একটী জন্ম সংঘটন করে। কারণ এক জন্মে অনেক কর্ম্মের ফল ভোগ হয়। যে কর্ম্মাশয়সমূহ হইতে একটী জন্ম হয় সেই জন্ম তাহা হইতে জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ লাভ করে। এই কর্ম্মসংস্কারসমূহ প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। জন্ম-জন্মান্তর হইতে লব্ধ এবং যাহার ফল এখনও ভোগ হয় নাই তাহার নাম সঞ্চিত। বর্ত্তমান জন্মে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহার নাম ক্রিয়মাণ এবং যাহার ফল সগুই ভোগ করা যাইতেছে তাহার নাম প্রারব্ধ। এই প্রারব্ধ কর্ম্ম বশতঃই দেহ ধারণ হইয়া থাকে। প্রারব্ধবশতঃই মনুষ্যাদির জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ সম্পাদিত হয় এবং স্বীয় প্রারব্ধ অনুযায়ী ব্রাহ্মণাদি কোন বর্ণে জন্ম হয়। তজ্জন্যই আয়ুঃ ও ভোগ সম্পাদিত হয়। কর্ম্মের মূল বাসনা এবং বাসনা হইতে সংস্কার উৎপন্ন হয়। সংস্কার-অনুযায়ী

এক বর্ণ হইতে অপর বর্ণে পৌছাইবার গুণগুলি অর্জ্জিত হইয়া থাকে এবং উচ্চ বর্ণে নীত হয়। শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ-কর্ম্ম-বিভাগশঃ" অর্থাৎ "প্রকৃতির তিন গুণ অনুযায়ী ও তদনুযায়ী কর্ম্মানুসারে, চারি ভাগে ভাগ করিয়া চারি বর্ণ আমি সৃষ্টি করিয়াছি।" এখানে গুণ শব্দে প্রকৃতির গুণ কেন বলা হইল তাহার কারণ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সেই গুণ ও তজ্জনিত কর্ম্মানুযায়ী জাতি বর্ণাদির সৃষ্টি হয়। কর্ম্ম কর্ত্তার স্বতন্ত্রতা থাকায় সে পুরুষকার দ্বারা অন্য গুণের অবস্থায় উন্নত হইতে পারে। ঋষিগণ তিন গুণের ক্রিয়া সমুদয় লক্ষ্য করিয়া চতুর্ব্বর্ণের নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সেই সেই বর্ণজাত কর্ত্তব্যসমূহ সম্পাদন দ্বারা তাঁহারা ক্রমশঃ তাহার ক্রিয়া পূর্ণ করতঃ অন্য বর্ণে নীত হইতে পারেন।

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রানাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব-প্রভবৈর্গুণৈঃ॥"

"স্বভাব অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন গুণ দ্বারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণের কর্ম্ম সকল বিভক্ত হইয়াছে।" জন্ম কর্ম্ম ও জ্ঞানের পূর্ণতা দ্বারা তাঁহারা স্বকীয় বর্ণের পূর্ণতা সম্পাদন করতঃ ক্রমশঃ শূদ্রত্ব হইতে বৈশ্যত্বে, বৈশ্যত্ব হইতে ক্ষত্রিয়ত্বে এবং ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে ব্রাহ্মণত্বে উপস্থিত হইতে পারেন। যদি কেহ শুধু জন্ম দ্বারা কোন বর্ণ প্রাপ্ত হন অথচ তাঁহাতে কর্ম্ম বা জ্ঞানের পূর্ণতা না থাকে তাঁহাকে পূর্ণরূপে তদ্বর্ণের বলা যায় না। যতক্ষণ তাঁহার ত্রিবিধ শরীর পূর্ণ প্রকৃতির না হয় ততক্ষণ উচ্চ বর্ণের বলিয়া গণ্য হন না। মহাভারতে ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যথা—

"তপঃ শ্রুতং যোনিশ্চাপি এতদ্ ব্রাহ্মণ্যকারণম্।
ত্রিভির্গুণৈঃ সমুদিত স্ততো ভবতি বৈ দ্বিজঃ॥
তপঃ শ্রুতঞ্চ যোনিশ্চ এতদ্ ব্রাহ্মণকারণম্।
তপঃ শ্রুতাভ্যাং যো হীনো জাতিব্রাহ্মণ এব সঃ॥"

মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব

"তপস্যা, বিদ্যা এবং জন্ম তিনটী ব্রাহ্মণত্বের কারণ, যাঁহার এই তিনটী গুণ বর্ত্তমান তিনিই পূর্ণ ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইবেন। যাঁহার তপস্যা এবং বিদ্যা নাই তিনি জাতিব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইবেন।"

যে কয়টী শ্লোক লইয়া তাঁহারা উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছেন এইবার তাহা আলোচনা করা যাইতেছে।

"শৌচাচারস্থিতঃ সম্যগ্ বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ। ৩ শ্লোক
নিত্যব্রতী সত্যপরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥ ১৮৯ অধ্যায়
জীবিতং যস্য ধর্ম্মার্থং ধর্ম্মোঽন্যার্থমেবচ।
অহোরাত্রং চ পুণ্যার্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥
শৌচেন সততং যুক্তঃ সদাচারসমন্বিতঃ
সানুক্রোশশ্চ ভূতেষু তদ্দ্বিজাতিষু লক্ষণম্॥
সর্ব্বভক্ষ্যরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ।
ত্যক্তবেদগুণাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতিস্মৃতঃ॥
শূদ্রে চৈতদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে চৈতন্নবিদ্যতে।"
ন চ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো নচ॥ মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব।

প্রথম তিনটী শ্লোকের মধ্যে ব্রাহ্মণের লক্ষণ দেখান হইয়াছে। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্বারা অনেকে বলিয়া থাকেন ব্রাহ্মণ

পূর্ব্বোক্ত গুণহীন হইলে অর্থাৎ সর্ব্ববস্তু ভক্ষণশীল, সর্ব্বকর্ম্মঅনুষ্ঠানকারী, বেদপরিত্যাগী ও অনাচারী হইলে তাহাকে শূদ্র বলা যায় এবং শূদ্রে যদি ব্রাহ্মণের লক্ষণ থাকে এবং ব্রাহ্মণের যদি তাহা না থাকে তাহা হইলে শূদ্রও শূদ্র নহে, এবং ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ নহে। এই শ্লোক দুইটী অবলম্বন করিয়া অনেকেই অনেক অকথা কুকথা বলিয়া থাকেন কিন্তু সেগুলি তাঁহাদের শাস্ত্রজ্ঞানহীনতা ও ব্রাহ্মণবিদ্বেষের পরিচায়ক। অত্রিসংহিতায় দশপ্রকার ব্রাহ্মণের লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে দুই একটী উল্লেখ করিয়া শাস্ত্র এবং যুক্তিসঙ্গত মীমাংসা দেখান যাইতেছে। ব্রাহ্মণ দশপ্রকার। যথা :—

"দেবো মুনির্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ।
পশুম্লেচ্ছোঽপি চাণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ॥" ৩৬৩

'দেব, মুনি, দ্বিজ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ ও চণ্ডাল।'

"সন্ধ্যাং স্নানং জপং হোমং দেবতানিত্যপূজনম্।
অতিথিং বৈশ্যদেবঞ্চ দেবব্রাহ্মণ উচ্যতে॥ ৩৬৪
বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ
সাঙ্খ্যযোগবিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে॥ ৩৬৭
ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥ ৩৭২
ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বকর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চাণ্ডাল উচ্যতে॥" ৩৭৪

এখানে ২য় ও ৩য় শ্লোকে দেবব্রাহ্মণ ও দ্বিজব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। ৪র্থ ও ৫ম শ্লোকে পশু এবং চণ্ডালব্রাহ্মণের লক্ষণ লিখিত

আছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় কর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ উন্নত হইলে তাহাকে দ্বিজ বা দেবতা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে, কিংবা অবনত হইলে পশু বা চণ্ডাল আখ্যায় অভিহিত করা হয়, কিন্তু জন্মগত ব্রাহ্মণত্বের কোনরূপ হানি হয় না। এইরূপ পূর্ব্বোক্ত 'সর্ব্বভক্ষণ' ইত্যাদি শ্লোকে যে ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় লিখিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে জ্ঞান ও কর্ম্মে হীন হইলে তাহাকে গুণে শূদ্রপ্রায়, অর্থাৎ শূদ্রব্রাহ্মণ বলা যায়; কিন্তু তাহাতে তাহার জন্মগত বর্ণত্বের কোন হানি হয় না। পরবর্ত্তী শ্লোকে ইহার আরও স্পষ্টতর রূপে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। সেই শূদ্র শূদ্র নহে, এবং সেই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নহে। এখানে পূর্ব্ববর্ত্তী শূদ্র ও ব্রাহ্মণ শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত, পরবর্ত্তী শূদ্র এবং ব্রাহ্মণ শব্দ সেই অর্থে ব্যবহৃত নহে। যদি একই অর্থে ব্যবহৃত হইত তাহা হইলে এক শব্দের দ্বারাই উহার তাৎপর্য্য নির্ণীত হইতে পারিত। এখানে শূদ্র, শূদ্র নহে অর্থাৎ যাহাতে ব্রাহ্মণের গুণ আছে এমন শূদ্র গুণে ব্রাহ্মণ সুতরাং জন্মগত শূদ্র হইলেও গুণগত নহে এবং ব্রাহ্মণ নীচকর্ম্মকারী হইলে গুণে শূদ্র তুল্য অর্থাৎ জন্মগত ব্রাহ্মণ হইলেও গুণগত ব্রাহ্মণ নহে। মহাত্মা বিদুর শূদ্র যোনিতে জাত হইয়াও ব্রাহ্মণগুণসম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে ব্রাহ্মণ আখ্যায় আখ্যাত করা হয় নাই। মহাভারতে উদ্যোগ-পর্ব্বান্তর্গত সনৎসুজাত পর্ব্বাধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক ব্রহ্মজ্ঞান পৃষ্ট হইয়াও বিদুর বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মাহাত্ম্য স্মরণ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—

"শূদ্রযোনাবহং জাতো নাতোঽন্যদ্বক্তুমুৎসহে।
কুমারস্য তু যা বুদ্ধির্ব্বেদ তাং শাশ্বতীমহং ॥
ব্রাহ্মীং হি যোনিমাপন্নঃ সুগূহ্যমপি যো বদেৎ।
ন তেন গর্হ্যো দেবানাং তস্মাদেতদ্‌ব্রবীমিতে ॥"

"আমি শূদ্রযোনিতে জাত সুতরাং ঐ সম্বন্ধে উল্লেখ করিতে অসমর্থ। কুমারের (সনৎকুমার) যাদৃশ জ্ঞান তৎসমুদয় আমি জ্ঞাত আছি; কিন্তু পুরাণ ভিন্ন শূদ্রের অন্য বিষয়ে বক্তার আসন দেওয়া হয় নাই, উহাতে ব্রাহ্মণেরই অধিকার, সুতরাং তাহা আমি বলিব না।" যদিও আজকাল রুচি এবং শিক্ষা অনুযায়ী এই বাক্যগুলি হয় প্রক্ষিপ্ত, না হয় ব্রাহ্মণঠাকুরদের স্পর্দ্ধা সূচনা করিবে তথাপি এতৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে তাঁহাদের কথা ভিন্ন আর কিছু বলার উপায় নাই; যাঁহারা শিক্ষা এবং সংসর্গের গুণে কিছুই মানিতে রাজী নহেন তাঁহাদিগের নিমিত্ত এই সব লিখিত হইতেছে না, সুতরাং তাঁহারা মনের সুখে গালি দিতে থাকুন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপকারিতা, এবং না মানিলে কি হয় পরে যুক্তির দ্বারা সাধ্যমত বুঝান যাইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে লিখিত আছে প্রথমসৃষ্ট প্রজা সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার। তাঁহারা ব্রহ্মার মানসসৃষ্ট প্রজা। তাঁহারা ঊর্দ্ধরেতা এবং মোক্ষধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন সুতরাং প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছা করেন নাই। তজ্জন্য ব্রহ্মা মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ এবং নারদ এই দশ জনকে পুনরায় সৃষ্টি করেন। ইঁহাদের মধ্যে সকলেই নিবৃত্তিপরায়ণ ছিলেন না, সুতরাং কয়েকজন প্রজা সৃষ্টি করিতে স্বীকৃত হন। এতদ্দ্বারা প্রথম সৃষ্টি সময়ে কিরূপে উচ্চ হইতে ক্রমশঃ নীচদিকে সৃষ্টির ধারা চলিতে থাকে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ প্রথম সৃষ্ট চারিপুত্রই নিবৃত্তিপরায়ণ ছিলেন। পরবর্ত্তী দশজনের মধ্যেও কয়েকটী নিবৃত্তিপরায়ণ ছিলেন। পরে সম্পূর্ণ প্রবৃত্তিপরায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বে ১৮৮ অধ্যায় ভৃগুভরদ্বাজ সংবাদে বর্ণসৃষ্টির উত্তম প্রণালী দেখান হইয়াছে:—

ভৃগুরুবাচ—

"অসৃজদ্ ব্রাহ্মণানেব পূর্ব্বং ব্রহ্মা প্রজাপতীন্।
আত্মতেজোঽভিনির্বৃত্তান্ ভাস্করাগ্নিসমপ্রভান্॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তম।
যে চান্যে ভূতসঙ্ঘানাং বর্ণাস্তাং শ্চাপি নির্ম্মমে॥"

"ব্রহ্মা প্রথমে সূর্য্য এবং অগ্নির সমান তেজস্বী আত্মবলে বলীয়ান্ প্রজাপতি ব্রাহ্মণ নির্ম্মাণ করেন। তৎপর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং অন্যান্য ভূতগণের নির্ম্মাণ করেন।" ভরদ্বাজ বলিলেন,—"স্বেদ, মূত্র, পুরীষ, শ্লেষ্মা প্রভৃতি সকলের দেহেই সমান ক্ষরিত হয়, সুতরাং বর্ণবিভেদ কি প্রকারে সঙ্গত হয়?" ভৃগু উত্তরে বলিতেছেন।

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতং॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মারক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টা স্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥"

সৃষ্টির প্রথমে একমাত্র ব্রাহ্মণ বর্ণই ছিল কারণ উহা সত্ত্বগুণের অবস্থা। তাঁহারা গুণজনিত কর্ম্মপ্রভাবে অন্যান্য বর্ণে পরিণত হইয়াছেন। প্রথমে দেখান গিয়াছে যে সৃষ্টিধারা ক্রমশঃ কিরূপে সত্ত্ব হইতে সত্ত্ব-রজঃ ইত্যাদি ভেদে অবরোহিণী গতিতে নামিয়া আসে; এখানেও তাহাই বর্ণিত

হইয়াছে। প্রথমে নিবৃত্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হন, পরে প্রবৃত্তি-পরায়ণ ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হন। তাঁহাদের ভিতর স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ তিন দেহের পূর্ণ উৎকর্ষ থাকায় তাঁহারা পূর্ণ ব্রাহ্মণ নামেই অভিহিত ছিলেন। সৃষ্টির ধারা ক্রমশঃ নীচাভিমুখী হইয়া গুণত্রয়ের সংমিশ্রণে অন্যান্য বর্ণের উৎপত্তি হয়। তাঁহাদের জ্ঞান, মন এবং শরীর তিনেরই উপর তাহার ক্রিয়া পতিত হইতে থাকে। সুতরাং ক্রমশঃ তদ্‌ভাবে ভাবিত হইয়া অর্থাৎ গুণ পরিণামে তাঁহারা ভ্রমরকীটের ন্যায় তজ্জাতীয়ত্ব প্রাপ্ত হন। শাস্ত্রদৃষ্টে আমরা দেখিতে পাই যে নন্দীশ্বর উৎকট তপস্যার ফলে তজ্জন্মেই দেবদেহ লাভ করেন এবং নহুষ পাপফলে তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হন; ইহা তাঁহাদের উৎকট পাপ বা পুণ্যের ফল। তদ্রূপ সৃষ্টি-ধারায় ক্রমশঃ গুণের নীচগামী ক্রিয়ায় পতিত হইয়া তজ্জনিত কর্ম্মপ্রভাবে সেই সব ব্রাহ্মণগণও ক্ষত্রিয়ত্ব বৈশ্যত্ব ও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন; এবং যাঁহারা অবরোহিণী গতির ভিতর পতিত হইয়াও পুরুষকার সহায়তায় ঊর্দ্ধদিকে গমন করিতে থাকেন তাঁহারা এই জন্মেই দেবত্ব, ব্রাহ্মণত্বাদি লাভ করিতে সমর্থ হন। এখানে তাহাই বর্ণিত আছে যে সত্ত্ব গুণ হইতে অবরোহিণী গতির মধ্যে আসিয়া তাঁহারা কিরূপে অন্য বর্ণে উপনীত হইলেন। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ কামভোগপ্রিয়, তীক্ষ্ণ, ক্রোধী ও সাহসী ছিলেন এবং কর্ম্মের উৎকট ফলে যাঁহাদের শরীরের বর্ণ শ্বেত হইতে রক্তে পরিণত হইল তাঁহারা ক্ষত্রিয় বর্ণে পরিণত হইলেন। যে সকল ব্রাহ্মণ কৃষি গোরক্ষা ইত্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন এবং যাঁহাদের বর্ণও পীত হইয়া গেল, তাঁহারা বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত হইলেন। যাঁহারা হিংসা ও মিথ্যাপ্রিয়, লোভী, সর্ব্বকর্ম্ম দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী এবং শৌচ ও আচারবিহীন হইলেন তাঁহাদের শরীরও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল এবং তাঁহারা শূদ্র বলিয়া পরিগণিত

হইলেন। সৃষ্টির প্রথমে একমাত্র সত্ত্ব গুণ ছিল সুতরাং তৎকালে এক মাত্র ব্রাহ্মণ বর্ণই ছিল। যদি একমাত্র গুণই বর্ত্তমান থাকিত তাহা হইলে চারি বর্ণের উৎপত্তি হইত না, একই মাত্র বর্ণ সংসারে বর্ত্তমান রহিত। আরও দ্রষ্টব্য এই যে তৎকালীন ব্রাহ্মণত্ব হইতে যাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্ব প্রভৃতিতে নামিয়া আসেন তাঁহাদের তৎতৎগুণ বা কার্য্যের এতই প্রবলতা ছিল যদ্দারা তাঁহাদের স্থূল শরীর পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই বিশেষত্ব নিমিত্তই বর্ণভেদ সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু আজ-কাল তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ ধারণাশক্তি অতি হীন হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিতেও এতাদৃশ প্রকরণ চলিয়া আসিতেছে। তজ্জন্য আদিতে সত্যযুগ এবং পূর্ণ সত্ত্বগুণের ক্রিয়া বর্ত্তমান ছিল এইরূপ বলা হয়। ক্রমশঃ ত্রেতা দ্বাপর এবং বর্ত্তমান কলিতে রজোমিশ্রিত তমোগুণ অধিক হওয়ায় বৈশ্য প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইতেছে। এবং কলিশেষে একমাত্র শূদ্রাচারে দেশ পূর্ণ হইয়া শূদ্রপ্রাধান্য লক্ষিত হইবে ও আর্য্যভাব দূরীভূত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে তজ্জন্যই তৎসময়ে ভগবান বিষ্ণু অবতীর্ণ হইয়া ম্লেচ্ছাদি সংহার করিবেন এই প্রকার শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। অনেকে মনে করিতে পারেন ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোথাও এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং ইহা প্রকৃতির অভিপ্রেত নহে বা সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বিরোধী। তাঁহাদের নিকট বক্তব্য এই যে ইহাকে প্রকৃতির অনভিপ্রেত বলা হউক বা ভগবানের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বিরোধী বলা হউক, ফল উভয়তঃই সমান; কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে পৃথিবীর অন্য কোন দেশে প্রকৃতির পূর্ণতা লক্ষিত হয় না, শুধু একমাত্র ভারতেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই দেশেই ষড়্ঋতুর পূর্ণ বিকাশ। হিমালয়ের মত পর্ব্বত, গঙ্গার ন্যায় বিশুদ্ধ জলপূর্ণ নদী, বাংলার ন্যায় শস্যশ্যামলা দেশ, রাজপুতনার

ন্যায় মরুভূমি, কাশ্মীরের ন্যায় ভূস্বর্গও সমস্ত রকম পশু পক্ষী প্রভৃতির একাধারে সমাবেশ আর কোথাও নাই; তাই প্রকৃতি মাতার সম্পূর্ণ বিকাশক্ষেত্র এই ভারতেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ছিল এবং ক্ষীণস্রোতা মন্দাকিনীর ন্যায় এখনও প্রবাহিত হইতেছে। যদিও প্রকৃতির নিম্নাভিমুখী গতিপ্রবাহে পতিত হইয়া তাহার কঙ্কাল মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে তথাপি তাহা পুনরায় একদিন পূর্ব্বাবস্থায় উপনীত হইতে পারে এরূপ আশা করা যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

বর্ণ এবং আশ্রম ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে প্রকৃতির নিম্নাভিমুখী ধারাকে বাধা দিবার নিমিত্তই বর্ণধর্ম্মের উৎপত্তি এবং ক্রমশঃ তদবস্থা হইতে উন্নত হইবার নিমিত্ত অর্থাৎ নিবৃত্তিপোষণের নিমিত্ত আশ্রমধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। মহর্ষি ভরদ্বাজ বলিয়াছেন—

"প্রবৃত্তিরোধকো বর্ণধর্ম্মঃ নিবৃত্তিপোষকশ্চাপরঃ, আশ্রমধর্ম্ম ইত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ "বর্ণ ধর্ম্ম দ্বারা জীবের প্রবৃত্তি রোধ করা যাইতে পারে এবং আশ্রমধর্ম্ম দ্বারা নিবৃত্তির পুষ্টি করিয়া চরমে ব্রহ্মপদে উপস্থিত হইতে পারা যায়।" বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এই নীচাভিমুখী গতিকে বাধা দিতে সমর্থ বলিয়াই বর্ণাশ্রমধর্ম্মাবলম্বী ভারতবাসী এত বাধা বিপত্তিতেও দণ্ডায়মান আছে। ঋষিগণ গুণ ও কর্ম্মের ভেদ জ্ঞাত ছিলেন; তাই তাঁহারা এই জন্মের কর্ম্মানুযায়ী সব লাভ হইতে পারে ইহা স্বীকার করিতেন না। উদর এবং পৃষ্ঠ যেরূপ অবিনাভাবী সম্বন্ধে আবদ্ধ, অর্থাৎ এক ভিন্ন অন্যের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না, তদ্রূপ জন্ম এবং কর্ম্ম একই বস্তুর এপিঠ ও ওপিঠ। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম সমূহের পরিণাম হইতে ইহ-জন্মের দেহ এবং এই দেহে সম্পাদিত কর্ম্মাদি দ্বারা পরদেহ উৎপন্ন হইবে। তত্তজ্জাতীয় কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন তত্তজ্জাতীয় সংস্কার তত্তজ্জাতীয়সংস্কারাপন্ন পিতামাতার নিকট জীবকে লইয়া যায় এবং তদনুযায়ী দেশ কাল ও

পাত্রের গৃহে জীব জন্মগ্রহণ করে। সুশ্রুত সংহিতা এতৎসম্বন্ধে বিশেষ বিচার পূর্ব্বক লিখিয়াছেন—

"কর্ম্মণা চোদিতো যেন তদাপ্নোতি পুনর্ভবে।
অভ্যস্তাঃ পূর্ব্বদেহে যে তানেব ভজতে গুণান্॥
অঙ্গপ্রত্যঙ্গনিবৃত্তিঃ স্বভাবাদেব জায়তে।
অঙ্গপ্রত্যঙ্গনিবৃত্তৌ যে ভবন্তি গুণাগুণাঃ॥
তে তে গর্ভস্য বিজ্ঞেয়া ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তজাঃ।
শুক্রশোণিতসংযোগে যো ভবেদ্দোষ উৎকটঃ॥
প্রকৃতি র্জায়তে তেন তস্যা মে লক্ষণং শৃণু।"

'যিনি যেরূপ কর্ম্ম করেন পরজন্মে তাদৃশ গুণ প্রাপ্তহন এবং পূর্ব্বার্জ্জিত গুণ সমূহই পরজন্ম পর্য্যন্ত অনুগামী হয়। শুধু তাহাই নহে দেহের প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তদ্‌গুণানুযায়ী হইয়া থাকে। পূর্ব্বজন্মে যেরূপ গুণ বা দোষ বর্ত্তমান থাকে, পর জন্মে তৎসমুদয়ই লাভ হয় এবং এরূপ পিতামাতার গৃহে জাত হয় যথায় শুক্রশোণিতও তদ্‌ভাবাপন্ন দেহ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয়।' মানুষের দৈহিক সংস্থান দৃষ্টেও তাহার গুণাবলী নির্ণীত হয়। তাহার প্রমাণ স্বরূপ কিছু উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা—

"বক্ত্রং সৌম্যং সমবৃত্তং অমলং শ্লক্ষং সুসম্যগ্ ভূপানাম্।
বিপরীতং ক্লেশভুজাং মহামুখং দুর্ভগানাঞ্চ॥
স্ত্রীমুখমনপত্যানাং শাঠ্যবতাং মণ্ডলং পরিজ্ঞেয়ম্।
দীর্ঘং মুখং নির্দ্রব্যানাং ভীরুমুখাঃ পাপকর্ম্মাণঃ॥
চতুরস্রং ধূর্ত্তানাং নিম্নং বক্ত্রং তনয়রহিতানাম্।
কৃপণানামতি হ্রস্বং সম্পূর্ণন্তু ভোগিনাং কান্তম্॥"

সমবৃত্ত—শিরা বর্জ্জিত সুঠাম নাতি দীর্ঘ নাতি হ্রস্ব মনোজ্ঞ এইপ্রকার সুগঠিত মুখমণ্ডল রাজা বা ধনশালীর হইয়া থাকে।

সমবিপরীত—যাহাদের দুঃখী হইবার এবং নানাপ্রকার ক্লেশ পাইবার কথা তাহাদের মুখ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকে।

মহা মুখ—যাহাদের মুখ ভারি, শরীর অপেক্ষা বড় বা চওড়া তাহাদিগের দুঃখ অবশ্যম্ভাবী।

স্ত্রী মুখ—যাহাদের মুখ স্ত্রীলোকের মত অর্থাৎ দাড়িগোঁফশূন্য তাহারা অনপত্য হইয়া থাকে।

মণ্ডল—যাহারা ধূর্ত্ত তাহারা প্রায়ই চ্যাপটামুখো হইয়া থাকে।

দীর্ঘ মুখ—যাহারা নির্ধন তাহাদের মুখ সম্মুখে নীচুদিকে বা তির্য্যগ্‌ভাবে লম্বা হয়।

ভীরু মুখ—যাহাদিগকে দেখিলে ভীত মনে হয় অথবা যে মুখ দেখিলে লোকের ভীতিসঞ্চার হয় অথবা যাহাদের বেঙ বা শিয়ালের মত মুখ, ইহারা সকলেই পাপপরায়ণ।

চতুরস্র—যাহারা ধূর্ত্ত তাহাদের মুখ চাক্‌লা হয় ইহাতে একটু কোণাকৃতি থাকিবে।

নিম্ন—খোঁদোল মুখ, প্রায়ই সন্তান হয় না।

অতি হ্রস্ব—নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা ছোট হইলে তাহারা কৃপণ হইয়া থাকে।

সম্পূর্ণ—সর্ব্বপ্রকারেই সুঠাম মুখ ভোগী ব্যক্তির হইয়া থাকে।

গুণ হইতে দেহ, এবং দেহ হইতে গুণ অনুমিত হইতে পারে; তাহার প্রমাণ স্বরূপ সামান্য কিছু উল্লেখ করা গেল। ইহা দ্বারা অকারণ উচ্চবর্ণে বা উচ্চ বংশে যে জন্মগ্রহণ হয় না তাহার কতকটা ধারণা বুদ্ধিমান ব্যক্তি করিতে পারেন। জীবের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম অনুযায়ী পিতা

মাতার গৃহে জন্ম হয় এবং প্রায়শঃই পিতামাতার প্রকৃতির কতকটা সাদৃশ্য বর্ত্তমান থাকে। যদিও বর্ত্তমান সময়ে তাহার অতিরিক্ত ব্যভিচার দেখাযাইতেছে পূর্ব্বেও কদাচিৎ ব্যভিচার দেখা যাইত; কারণ, তাহা অধিকাংশ পিতা মাতার তাৎকালিক মনোবৃত্তির উপর নির্ভর করে। শ্রুতিপ্রমাণে আমরা ইহার সত্যতা জানিতে পারি যথা—

'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ'। 'অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে'।

অর্থাৎ 'পুত্র আত্মরূপ হইতে উৎপন্ন হয়। সমুদয় অঙ্গ, সমুদয় অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হয় ইত্যাদি।'

মহাভারতে ইহার একটী জ্বলন্ত প্রমাণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। আজকাল দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী ইত্যাদি লইয়া অনেকেই কটাক্ষ করেন; কিন্তু তাঁহারা বোধ হয় জ্ঞাত নহেন যে, কিরূপ মনোবৃত্তির উচ্চতা দ্রৌপদীতে বর্ত্তমান ছিল; যাহার ফলে পঞ্চ পাণ্ডবের প্রত্যেকের অনুরূপ পাঁচটী পুত্র উৎপন্ন হইযাছিল, এবং তাহাদিগকে পঞ্চপাণ্ডব মনে করিয়া পঞ্চ-পুত্রকেই অশ্বত্থামা হত্যা করিয়াছিলেন। কতটা ধারণাশক্তি বলবতী হইলে—কতটা স্বামীতে তন্ময় হইতে পারিলে—এতাদৃশী অবস্থা লাভ করা যায়, তাহা আজ ভারতসন্তানের জ্ঞান এবং বুদ্ধির অগোচর হইয়া পড়িয়াছে। পঞ্চ স্বামী বর্ত্তমান থাকিতে একই সময়ে এক জনকে স্বামী, এবং অন্য সকলকে দেবর বা ভাসুর জ্ঞানে ব্যবহার করা যে কতদূর অসাধারণ মনোবৃত্তির পরিচায়ক, তাহা যিনি মনোবৃত্তিনিরোধপরায়ণযোগী তিনিই বুঝিতে পারেন, অন্যের কেবল হাস্যরসের উদ্রেক হইতে পারে। যাঁহারা নিজে লম্পট, তাঁহাদের সর্ব্বত্রই তদ্রূপ দৃষ্টি অসম্ভব নহে।

প্রবৃত্তিরোধের দ্বারা সংযম শক্তির বৃদ্ধি হইলে বংশের মুখ উজ্জ্বলকারী

পুত্রে জন্মা সম্ভব, তাই ঋষিরা বর্ণধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; ছাগতান্ত্রিক জীবের তাহা অনুভবগম্য নহে। অন্যান্য প্রাণিগণ প্রকৃতির প্রেরণাতে আহারনিদ্রাদি সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করে, মানুষের স্বতন্ত্রতা থাকায় সে প্রকৃতির ক্রিয়া উল্লঙ্ঘন করতঃ যথেচ্ছাচারী হয়, এবং ভোগ্য-বস্তুর নানাপ্রকার উপকরণ সংগ্রহের ব্যবস্থা করে; তাহারই রোধের নিমিত্ত বর্ণধর্ম্মের ব্যবস্থা। প্রারব্ধকর্ম্মানুযায়ী প্রকৃতির গুণ আশ্রিত হইয়া জন্ম হয় সুতরাং সেই গুণের পূর্ণতা শেষ করিয়া পরবর্ত্তী গুণোচিত-বর্ণে আরোহণ করিতে কতটা অসাধারণত্ব, যোগশক্তির প্রাবল্য ও সংযমের পরাকাষ্ঠা প্রয়োজন, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই; শুধু ব্যাসের নীচ যোনিতে জন্ম, বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে তজ্জন্মেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং একটী সত্য কথা বলিয়া বা হোম করিয়া উপনয়ন গ্রহণ করিলেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইতে পারে, ইহা বিজ্ঞ ব্যক্তির মীমাংসিত সত্য নহে। কতকটা রাজনৈতিক চালবাজি এবং কতকটা স্বীয় জন্মকর্ম্মোচিতদম্ভের অবতারণা ইহার মূলে রহিয়াছে। অনার্য্যরক্ত অথবা সংস্পর্শ ভিন্ন ইহা হইতে পারে, এরূপ বিশ্বাস আর্য্যদের ছিল না। আরও একটী আশ্চর্য্যের বিষয়, যদি ব্যাস বিশ্বামিত্রের দৃষ্টান্তই তাঁহারা বিশ্বাস করেন, তবে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যে পরাশর মুনি কামমোহিত হইয়াও কুজ্ঝটিকাসৃষ্টি করিয়াছিলেন, সত্যবতী ক্ষত্রিয়বীর্য্যে মৎস্যের উদরে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন, এবং ব্যাসদেবের গর্ভাধান মাত্রেই জন্ম হইয়াছিল এবং তখনই তিনি তপস্যার্থ প্রস্থান করিয়াছিলেন, এই সব কথা কি তাঁহারা বিশ্বাস করেন? বা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দেন? অথবা রূপক বলিয়া মনে করেন? যদি প্রক্ষিপ্ত হয় তবে ঘটনাটী তাঁহারা প্রক্ষিপ্ত করুন না কেন? তাহাতে তাঁহাদের অভীষ্টসিদ্ধি হয় না। তাই সে পথে যাইতে প্রাণে

বড় ব্যথা লাগে। বিশ্বামিত্রের মত ব্রাহ্মণ হইতে হইলে, তাঁহার জন্মের কারণ এবং অসাধারণ তপস্যার ফলে শরীরের প্রতি পরমাণু পর্য্যন্ত বদ্‌লাইবার ক্ষমতা লাভ করা ইত্যাদি বিশ্বাস করা প্রয়োজন, নতুবা শুধু গলাবাজি ও পুস্তকের সাহায্যে বর্ত্তমান ক্ষীণশক্তি, হীনবল, তপস্যাহীন ও উদরভরণে অক্ষম ব্রাহ্মণজাতিকে পদদলিত করিতে সক্ষম হইলেও প্রকৃতির রাজত্বে ব্রাহ্মণত্বের দাবী অসম্ভব। ব্রহ্মজ্ঞানের ভাণ করিয়া যেমন যথেচ্ছাচার, যথেচ্ছভক্ষণ আজকালকার ধর্ম্ম হইয়াছে, এদিকেও অনেকটা তাই; তাঁহারা জানেন না যে বস্তুশক্তির ক্রিয়া যতক্ষণ শরীরের উপর প্রকাশ সম্ভব, ততক্ষণ যথেচ্ছ আহারব্যবহার সাধুজনবিগর্হিত। শরীর ও মন সমভাবে প্রকৃতির পারে না যাইলে উহাতে মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। যদি এখনও কেহ ঐরূপ অসাধারণত্ব লইয়া নীচবর্ণে জাত হন, তাহা হইলে তিনিও সেই উচ্চ অবস্থা লাভ করিবেন। গলাবাজি করিয়া তাঁহাকে কেহই নিরস্ত করিতে পারিবে না। শুধু বচনজীবী হইলে কোন দিনই তাহা সম্ভবপর হইবে না।

সকলেই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন সুতরাং ব্রাহ্মণ. এবং সকলেই মানুষ সুতরাং মানুষ মাত্রেরই বেদে অধিকার আছে, এই প্রকার উক্তির মূলেও অত্যন্ত অজ্ঞতা বর্ত্তমান আছে। ইহাতে ব্রাহ্মণের হিংসা নাই বরং অন্য-বর্ণের প্রতি বিশেষ অনুকম্পাই লক্ষিত হয়। শাস্ত্র বলেন—

"দুষ্টঃ শব্দঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ" ॥

'বেদমন্ত্র স্বর এবং বর্ণের সহিত উচ্চারিত না হইলে এবং অশুদ্ধরূপে উচ্চারিত হইলে যজমানের (উচ্চারণ কর্ত্তার) নাশের কারণ হয়; যেমন

'ইন্দ্রশত্রু' শব্দের উচ্চারণদোষে বৃত্রাসুরের উৎপত্তি হইয়া ইন্দ্র কর্তৃক হত হইয়াছিল।' বৈদিক মন্ত্র ঠিক বর্ণ ও স্বরে উচ্চারিত না হইলে উপকার না হইয়া বরং সর্ব্বনাশের কারণ হয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা"
"বেদাক্ষরবিচারেণ শূদ্রশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ"
"স্ত্রীশূদ্রৌ নাধীয়াতাম্"

ইহার অর্থ এই যে, স্ত্রী এবং শূদ্রকে বেদ উচ্চারণ করিতে দিবে না; বা তাহারা যেন পাঠ না করে। ইহা কি হিংসামূলক-আচরণ অথবা সত্যকথন? ইন্দ্র গুরুপত্নী গমন করিয়াছিলেন, শিব উলঙ্গ হইয়া পরিভ্রমণ করেন; বিষ্ণু তুলসীর সতীত্ব নষ্ট করেন এই সব কথা বলিলে তাঁহাদের স্তুতি করা হয়, অন্ততঃ স্তোত্রাদিতে এই সব উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু যে যুগে সভ্যতাভিমানী পণ্ডিতগণ মুখে অশ্লীলতার ভাণ করিয়া কিরূপ শীলতা আচরণ করিতেছেন, তাহা বলিলেই কারাগারে বাস অনিবার্য্য হইয়া পড়ে, সে যুগে স্ত্রীত্ত শূদ্রকে বেদ পড়াইবে না বলিলে, তাহাদের স্বরূপ প্রচার করিলে যে, নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ মহাশয়ের টিকি কাটিতে হইবে, তাহার চৌদ্দ পুরুষের পিণ্ডপাত করিতে হইবে ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

তাঁহারা স্ত্রী, শূদ্র, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি কল্পিত মনে করেন কাজেই কল্পিত-বস্তুকে উড়াইতে যত্নবান হন। সোজাসুজি মানি না বলিয়া উড়াইয়া দিলে বিশেষ কোন দুঃখের কারণ ছিল না; কিন্তু শাস্ত্রযুক্তির দোহাই করোর প্রয়োজনীয়তা কি? বেদ পুরাণ সকলগুলিই ব্রাহ্মণ জাতির তাৎবিগত সম্পত্তি সুতরাং তাঁহারা যে বিজাতীয়দিগকে ঘৃণা করিবেন,

তাহাতে আর সন্দেহ কি, ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইত ; বৃথা পাণ্ডিত্যের অভিমান লইয়া সব এক বলিলে কি লাভ হইবে ? তাঁহারা একত্ব কিসে পাইলেন ? জাতি জিনিসটা কি তাহা আলোচনা করিলে যদি তাঁহাদিগের একটু বহুত্বের উপর দয়া হয় তাহা হইলেই যথেষ্ট মনে করা যায়। তাঁহারা শাস্ত্র আওড়ান সুতরাং একটু তাহাই বলা যাক্।

'জাতি' কি জানিতে হইলে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লইতে হইবে। ব্যাকরণ অনুযায়ী জনী ধাতু অপাদানে ক্তি প্রত্যয় করিলে 'জাতি' শব্দ সিদ্ধ হয়। জন্ ধাতুর অর্থ প্রাদুর্ভাব। 'জায়তে প্রাদুর্ভবতি একত্ববুদ্ধির্যস্তাঃ সা জাতিঃ'। অর্থাৎ একটী বিষয় দর্শন করিয়া প্রমাণান্তর ভিন্ন তাহা জ্ঞানের বিষয় হইলে তাহাকে জাতি বলা যায়। যেমন 'ঘট' এই শব্দ দ্বারা কম্বুগ্রীবাদিমান্ পদার্থকে বুঝা যায়। প্রমাণান্তর ব্যতিরেকেই যাহা জ্ঞানের গোচর হয় তাহাই নৈয়ায়িক এবং বৈয়াকরণগণের উক্ত জাতি শব্দের অর্থ।—

অন্য প্রকার—

'আকৃতিগ্রহণাৎ জাতিঃ'—অনুগত আকৃতির দ্বারা যাহা প্রকাশিত হয় তাহাই জাতি ; যেমন মানুষ, ঘট, পট ইত্যাদি। কিন্তু এই লক্ষণে সর্ব্বদেশ প্রকাশ পায় না। যেমন শিখা ও সূত্র দ্বিজাতিমাত্রেরই থাকে সুতরাং আকৃতি দেখিয়া জাতি নির্ণীত হইল না। তজ্জন্য তাঁহারা সমানরূপতা বা একরূপতাকে জাতি বলেন। যথা—

"সামান্যং দ্বিবিধং প্রোক্তং পরং চাপরমেবচ।
দ্রব্যাদিত্রিকবৃত্তিস্তু সত্তা পরতয়োচ্যতে॥
পরাভিন্না চ যা জাতিঃ সৈবাপরতয়োচ্যতে।
ব্যাপকত্বাৎ পরাপি স্যাদ্ ব্যাপ্যত্বাদপরাপি চ"॥

এখানে সামান্য শব্দের অর্থ টীকাকার বলিতেছেন যথা—"নিত্যত্বে সতি অনেকসমবেতত্বম্" অর্থাৎ যাহা নিত্য হইয়া অনেক বস্তুতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে, তাহাকে সামান্য বা জাতি বলে—যেমন মনুষ্যত্ব, ঘটত্ব, ইত্যাদি।

সমবায় অর্থ—'একনিত্যসম্বন্ধত্বং সমবায়ত্বং'; অর্থাৎ একটী নিত্য-সম্বন্ধবিশেষ, যেমন গুণ ও গুণীর; শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ। পূর্ব্বের জাতিলক্ষণে সংযোগ নামক গুণ ও অত্যন্তাভাব নামক অভাবদ্রব্য জাতি হউক, এইরূপ সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু তাহা সিদ্ধ হয় না কারণ সংযোগ অনেকে থাকিলেও তাহা নিত্য নহে, কারণ সংযোগ হইলেই তাহার বিয়োগ রহিয়াছে। তেমনই অত্যন্তাভাব যদিও নিত্য এবং অনেক বস্তুতে থাকে তথাপি সমবায় সম্বন্ধে থাকে না, সুতরাং তাহাও জাতি হয় না। সুতরাং জাতি শব্দ দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে যাহা একটি বস্তুতে থাকে না, এবং নিত্য হইয়া সমবায় সম্বন্ধে অনেক বস্তুতে থাকে, তাহাই জাতি বা সামান্য। এই জাতি পরা ও অপরা ভেদে দুই প্রকার; যাহা দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মে থাকে তাহাই পরাজাতি এবং ইহার অন্যনাম সত্তা। তদ্ভিন্ন অন্যরূপই অপরা জাতি। ইহার মধ্যে কিছু বিশেষ আছে যেমন দ্রব্যত্ব পরা জাতি ও অপরা জাতি দুইই হয়।

বৈশেষিকের মতে দ্রব্য নয়টী—ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, দিক্, কাল আত্মা ও মন; সেই কারণে দ্রব্যত্বজাতি কেবল এই কয়টীর উপরেই থাকে। কিন্তু সত্তা, দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মে থাকে বলিয়া পরাজাতি বা ব্যাপক (অধিকদেশব্যাপী)। দ্রব্যত্বজাতি ব্যাপ্য ও ব্যাপক দুইই হয়। দ্রব্যত্ব কেবল দ্রব্যের উপর থাকে পরন্তু সত্তা দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম তিনের উপর থাকে বলিয়া উহা সত্তা অপেক্ষা ব্যাপ্যজাতি; আবার ক্ষিতিত্ব হিসাবে ব্যাপকজাতি কেননা দ্রব্যত্ব ক্ষিতি প্রভৃতি নয়টী দ্রব্যের উপরেই থাকে পরন্তু ক্ষিতিত্ব কেবল ক্ষিতির উপর থাকে মাত্র। এইরূপ ক্ষিতিত্ব

আবার পরা ও অপরা জাতি ভেদে দ্বিবিধ। ঘটত্বের সহিত তুলনা করিলে ইহা বুঝিতে পারা যায়, কারণ ঘটত্ব শুধু ঘটেই নির্ভর করে, এবং ক্ষিতিত্ব ঘট, পট, দেয়াল, ইত্যাদি সর্ব্বস্থানেই বিরাজমান। সুতরাং ঘটত্ব বা পটত্ব ছোট বা ব্যাপ্য, তজ্জন্যই ইহা অপরা জাতি বলিয়া কথিত হয়। যেরূপ দ্রব্যত্বের ব্যাখা করা গেল তদ্রূপ গুণত্বেরও বুঝিতে হইবে। গুণ কণাদের মতে ২৪টী। যথা—

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, কৃতি, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ইচ্ছা, দ্বেষ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ ও সংস্কার। তন্মধ্যে 'গুণত্ব' পরা ও অপরা জাতি, কারণ দ্রব্য গুণ ও কর্ম্মবৃত্তি সত্তা হইতে অল্পদেশব্যাপী এবং রূপত্ব রসত্বাদি হইতে অধিকদেশব্যাপী। কিন্তু গুরুত্ব অপরা জাতি কারণ উহা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অল্পদেশব্যাপী।

কর্ম্ম উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন ভেদে পাঁচ প্রকার। কর্ম্মত্বও দ্রব্যত্ব ও গুণত্বের তুল্য, সুতরাং উল্লেখ করা হইল না।

এই সমুদয় আলোচনা দ্বারা আমরা পাইলাম যে, জাতি দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের উপর থাকে। গুণত্ব, কর্ম্মত্ব ও দ্রব্যত্ব সমবায় সম্বন্ধে তত্তৎপদার্থে থাকে, ইহারা কেহ আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না।

ঘট যখন অর্দ্ধভগ্ন হয় ও পুরাতনদশাগ্রস্ত হয়, নূতনের মত জলানয়নাদি ক্রিয়া থাকে না, সে ঘটকে নামমাত্র ঘট বলা যাইবে। প্রকৃত ঘট তাহাই যাহাতে গুণ ও কর্ম্ম পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। এইরূপ ব্রাহ্মণাদির মধ্যেও যদি যজ্ঞাদিসৎক্রিয়া না থাকে তাহাকে নামমাত্র ব্রাহ্মণাদি বলা যায়। এইরূপেই সর্ব্বজাতির উৎপত্তি হয়। অনেকেই ইহার মর্ম্মাবধারণ করিতে পারিবেন না, সুতরাং লৌকিক দৃষ্টান্ত বলা যাইতেছে। জাতি যথা—

জাতি	সাধারণভেদ	
(১) উদ্ভিৎ—বিশ্লেষণ করা যায় না, বা অনেক স্থলেই একাধারেই স্ত্রীত্ব ও পুংস্ত্ব লক্ষিত হয়।		
(২) মৎস্য—	স্ত্রী	পুরুষ
(৩) পক্ষী—	”	”
(৪) পশু—	”	”
(৫) মানুষ—	”	”

(১) উদ্ভিৎ জাতি বলিতে যাহা মাটি ভেদ করিয়া উঠে এবং অন্যত্র যাইতে পারে না তাহাই বুঝায়। তন্মধ্যে লতা, গুল্ম ও বৃক্ষ ভেদ আছে।

(২) মৎস্য—রোহিত, চিংড়ী ইত্যাদি।

(৩) পক্ষী—কোকিল, কাক, শ্যামা ইত্যাদ।

(৪) পশু—গরু, ঘোড়া, উট, ছাগল ইত্যাদি।

(৫) মনুষ্য—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ম্লেচ্ছ ইত্যাদি।

ভেদ তিন প্রকার স্বজাতীয়, বিজাতীয়, ও স্বগত। এক জাতীয় উভয় বৃক্ষের যে ভেদ তাহার নাম স্বজাতীয়, যেমন ছোট আম গাছ, বড় আমগাছ। একজাতি হইতে অন্য জাতির প্রভেদের নাম বিজাতীয় ভেদ; যেমন আম হইতে কাঁঠালের প্রভেদ। স্বগত—এক অঙ্গ হইতে অন্য অঙ্গের; যেমন ডাল, পাতা ও কাণ্ডের প্রভেদ।

যেরূপ উদ্ভিদের প্রভেদ দেখান হইল তদ্রূপ মৎস্যে, পক্ষীতে, পশুতে এবং মানবে উহা বর্ত্তমান আছে। প্রত্যেকেরই গুণ, কর্ম্ম এবং প্রকৃতি স্বতন্ত্র সুতরাং তাহাদের পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। তজ্জন্য সকলের পক্ষে এক ব্যবস্থা হইতে পারে না। পশুপক্ষী হইতে মানুষ শরীরে স্ত্রী পুরুষ ভেদে দেহ মন এবং জ্ঞান সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্, তাহা সম্ভবতঃ অধিক

বলিতে হইবে না। স্ত্রীদেহের কোমলতা, স্বরের সূক্ষ্মতা বা স্ত্রী-চিহ্নাদি পুরুষ দেহে নাই, বা পুরুষ দেহের দৃঢ়তা, স্বরের গাম্ভীর্য্য বা পুরুষচিহ্নাদি স্ত্রীদেহে নাই। পরস্পরের অঙ্গসংস্থান একরূপ নহে সুতরাং একইরূপ ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান উভয়ের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। এইরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণ পরস্পর হইতে গুণ, কর্ম্ম ও দেহের উপাদানগত বিশিষ্টতায় উৎপন্ন। সেই বিশিষ্টতা রক্ষা করাই তাহাদের ধর্ম্ম। যেমন স্ত্রীশরীরে গর্ভগ্রহণ এবং পুরুষ কর্ত্তৃক বীজাধান ক্রিয়াসম্পন্ন হয় ও ইহার ব্যতিক্রম প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ ও অসম্ভব, তদ্রূপ দ্বিজাতির পাঠ্য এবং উচ্চার্য্য বেদমন্ত্র স্ত্রী এবং শূদ্রদেহের অনুপযোগী। তাহার উচ্চারণাদি সেই সেই শরীরে অসম্ভব এবং তজ্জন্য স্থানবিশেষে প্রাণহানি বা মানসিক বিকৃতি পর্য্যন্ত সম্ভব। এতদ্ভিন্ন উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত-ভেদে স্বরত্রয় জিহ্বায় উচ্চারিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই, ইহাই সাধারণ নিয়ম। বাদী বলিতে পারেন যে, বেদে যদি স্ত্রীলোক ও শূদ্রের উচ্চারণ করা নিষেধ থাকিত তাহা হইলে বিশ্ববারা, কুহূ, ইন্দ্রমাতৃকা, অপালা, গার্গী, বাচক্লবী প্রভৃতি ঋষিত্বপ্রাপ্ত স্ত্রীগণ কি বেদে অধিকার না পাইয়াই ঋষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন? অথবা কবষ, মতঙ্গ প্রভৃতি শূদ্রগণ কি প্রকারে ঋষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন? ইহা কি বেদের উক্তি নহে? তাঁহাদের প্রশ্নের মীমাংসা করা যাইতেছে। তাঁহারা কি বেদ উচ্চারণ পূর্ব্বক কর্ম্মকাণ্ডোক্ত যাগযজ্ঞাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন, এবং আচার্য্যের পদ গ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন? যাঁহারা তাঁহাদিগকে ঋষিত্ব দিতেও আপত্তি করিলেন না তাঁহারা এটুকু প্রক্ষিপ্ত করিলেন কি প্রকারে? মনে রাখিতে হইবে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা তাঁহাদের নিকট অপরিচিত ছিল সুতরাং মিথ্যা বলিতে তাঁহারা অনভ্যস্ত ছিলেন। তবে ইহার কারণ কি? কারণ, বেদ ভিন্ন অন্যান্য

সমুদয় শাস্ত্রেই তাঁহাদের অধিকার ছিল, তাহা না হইলে শূদ্র সূতকে পুরাণব্যাখ্যাতার আসনে স্থাপিত করা হইত না এবং শৌনকাদি ঋষিগণ শূদ্রের নিকট উহা শ্রবণ করিতেন না। শারীরিক ও মানসিক ভিন্নতা হেতু এবং স্থূল সূক্ষ্ম দেহের ধারণার অনুপযোগী বলিয়া ঐ অধিকার তাঁহাদের দেওয়া হয় নাই। কিন্তু জ্ঞানলাভের জন্য ঐ বেদের ব্যাখ্যা-স্বরূপ স্মৃতি ইতিহাসাদির শ্রবণ তাঁহাদের পক্ষে বিহিত থাকায়, তাঁহারা আচার্য্যমুখে তৎসমুদয় শ্রবণে ব্রহ্মজ্ঞান পর্য্যন্ত লাভ করিতেন, তাহা সুলভাজনক সংবাদে এবং অনেক স্থলেই প্রমাণিত আছে। পরন্তু বেদমন্ত্রহীন যজ্ঞাদিতেও তাঁহাদের পূর্ণ অধিকার ছিল তাহা অতি গোঁড়া-নামে অভিহিত মনুও বলিয়াছেন যথা—

"ধর্ম্মেপ্সবস্তু ধর্ম্মজ্ঞাঃ সতাং বৃত্তিমনুষ্ঠিতাঃ।
মন্ত্রবর্জ্জ্যং ন দুষ্যন্তি প্রশংসাং প্রাপ্নুবন্তি চ॥
যথা যথা হি সদ্বৃত্তমাতিষ্ঠত্যনসূয়কঃ।
তথাতথেমঞ্চাঽমুঞ্চ লোকং প্রাপ্নোত্যনিন্দিতঃ॥"

"ধর্ম্মেপ্সু, ধর্ম্মজ্ঞ ও সদ্বৃত্তিপরায়ণ শূদ্রও ব্রাহ্মণাদির অনুষ্ঠিত মহা-যজ্ঞাদি কর্ম্ম বৈদিকমন্ত্র ত্যাগ করতঃ অনুষ্ঠান করিতে পারেন। অসূয়াশূন্য হইয়া তদ্রূপ অনুষ্ঠান করিলে তাঁহার ইহলোকে যশঃ এবং পরলোকে উচ্চগতি লাভ হয়।" শাস্ত্রে যদিও স্ত্রীশূদ্রাদির ব্যবস্থা এইরূপই দৃষ্ট হয় তথাপি পূর্ব্বকল্পে দ্বিজাতীয় স্ত্রীগণ কদাচিৎ উপনয়নসংস্কারার্হ হইতেন এবং বেদাভ্যাস করিতেন এরূপ প্রমাণ আছে। তাঁহাদিগকে আরূঢ়পতিতা বলা হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে যাঁহারা পূর্ব্বজন্মে পুরুষদেহধারী ছিলেন এবং ব্রহ্মজ্ঞানরত ছিলেন কিন্তু কোন

পাপ বশতঃ স্ত্রীদেহ ধারণ করিতে বাধ্য হন, তাঁহারাই আরূঢ়পতিতা নামে অভিহিত হইতেন।

দক্ষ সংহিতা যথা—"অদুষ্টাপতিতাং ভার্য্যাং যৌবনে যঃ পরিত্যজেৎ।
স জীবনান্তে স্ত্রীত্বঞ্চ বন্ধ্যাত্বঞ্চ সমাপ্নুয়াৎ॥"

"নির্দ্দোষী এবং নিষ্পাপা ভার্য্যাকে যিনি যৌবনে ত্যাগ করেন তিনি পরজন্মে বন্ধ্যা স্ত্রী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।" ভাগবত যথা—

"শাশ্বতীরনুভূয়ার্ত্তীঃ প্রমদাসঙ্গদূষিতঃ।
তামেব মনসা গৃহ্ণন্ বভূব প্রমদোত্তমা"॥

"পুরঞ্জন প্রমদাসঙ্গদোষে বহুদিন দুঃখ অনুভব করিয়া মৃত্যু সময় স্ত্রী স্মরণ করিতে করিতে মৃত হন এবং স্ত্রী দেহ প্রাপ্ত হন।"

গীতা বলেন—"যং যং বাপিস্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ"॥

"জীব মৃত্যুকালে মনে যে চিন্তা লইয়া দেহ ত্যাগ করে তদনুযায়ী গতিপ্রাপ্ত হয়।" এখানে স্ত্রীত্বপ্রাপ্তির দুইটী কারণ লেখা হইল। মৃত্যুকালীন স্ত্রীচিন্তা এবং নিষ্পাপা স্ত্রীকে যৌবনে ত্যাগ ; এই দুই কারণে যাহাদের স্ত্রীত্বপ্রাপ্তি হয়, কিন্তু ব্রহ্মবীজ অন্তঃকরণে জাগ্রত থাকে তাঁহাদের নিমিত্ত উপনয়নাদি সংস্কার ছিল। মহর্ষি হারীত যথা—

"দ্বিবিধা হি স্ত্রিয়ো ব্রহ্মবাদিন্যঃ সদ্যবধূশ্চ।
তত্র ব্রহ্মবাদিনীনামুপনয়নমৌঞ্জীবন্ধনং বেদাধ্যয়নং স্বগৃহে ভিক্ষাচর্য্যা।"

"স্ত্রী দুই প্রকারের—ব্রহ্মবাদিনী এবং সদ্যবধূ, তন্মধ্যে ব্রহ্মবাদিনী-দিগের জন্য মৌঞ্জীবন্ধন, উপনয়ন, বেদাধ্যয়ন এবং স্বগৃহে ভিক্ষাচর্য্যার ব্যবস্থা," এবং সদ্যবধূর নিমিত্ত বিবাহ সংস্কার।

মহর্ষি যম যথা—"পুরা কল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে।
অধ্যয়নঞ্চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা॥
পিতা পিতৃব্যো ভ্রাতা বা নৈনামধ্যাপয়েৎপরঃ।
স্বগৃহে চৈব কন্যায়া ভৈক্ষ্যচর্য্যা বিধীয়তে।
বর্জ্জয়েদজিনং চীরং জটাধারণমেবচ॥" বৃদ্ধযম।

"পুরাকল্পে কুমারীদিগের মৌঞ্জীবন্ধন, বেদাধ্যয়ন এবং সাবিত্রী-পাঠের ব্যবস্থা ছিল। তাঁহারা পিতা পিতৃব্য এবং ভ্রাতার নিকট অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহারা নিজ গৃহেই ভিক্ষা লাভ করিতেন। কিন্তু জটা বল্কল ও অজিন নিষিদ্ধ ছিল।" ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে অসাধারণত্ব বশতঃ ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রীগণ চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করতঃ বেদাধ্যয়নাদি করিতেন; কালধর্ম্মে ক্রমশঃ তাহা লোপ হইয়া যায়। বর্ত্তমান তমোময় কলিযুগে এতাদৃশ ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয় না। বর্দ্ধমান সোয়াঞী গ্রামের হঠী বিদ্যালঙ্কারের নাম বোধহয় অনেকে জ্ঞাত নহেন। তিনি পরম বিদুষী ছিলেন এবং তৎকালীন কাশীস্থ বিখ্যাতনামা পণ্ডিতদিগের সহিত প্রকাশ্য সভায় বিচারাদির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। এখনও কেহ কেহ এইরূপ বিদুষী থাকিতে পারেন।

লৌকিকদৃষ্টিতে সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী আইন প্রস্তুত হয়। যদি কেহ অসাধারণত্ব প্রভাবে তাহার ব্যতিক্রম করিতে সমর্থ হন তিনিও আর্য্যশাস্ত্রে অতি উচ্চ সম্মানে পূজিত হইয়া থাকেন।

শাস্ত্রের কোন এক স্থান হইতে মতপোষক একটী শ্লোক বা একটী দৃষ্টান্ত বাহির করিয়া অন্যের উপর অযথা আক্রমণ করা বা গালি দেওয়া মূর্খজনোচিত ব্যবহার। উহাতে অসন্তোষের মাত্রা বর্দ্ধিত হইয়া সমাজ এবং দেশের ধ্বংসসাধন ভিন্ন অন্য কিছু হয় না। মনুসংহিতাকার ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের নিমিত্ত অনুলোম বিবাহ প্রথার সমর্থন করিয়াছেন এবং শূদ্রের করেন নাই। ইহার ভাল বা মন্দ ফল আলোচনা করার সময় আমাদের নাই শুধু অধিকারনির্ণয় আমাদের উদ্দেশ্য সুতরাং তাহার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে দুই চারি কথা দিগ্‌দর্শনের ন্যায় বলিতে হইতেছে। যিনি অসবর্ণ বিবাহের সমর্থন করিয়াছেন তিনিই বলিয়াছেন—

"শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্।
জনয়িত্বা সুতং তস্যাং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে॥
দৈবপিত্র্যাহ্‌হতিথেয়ানি তৎ প্রধানানি যস্য তু।
নাশ্নন্তি পিতৃদেবাস্তান্ন চ স্বর্গং স গচ্ছতি॥"

"ব্রাহ্মণ শূদ্রাগমন করিলে অধোগতি প্রাপ্ত হন। শূদ্রাতে তাঁহার পুত্রোৎপত্তি হইলে ব্রাহ্মণত্ব হইতে তিনি চ্যুত হন এবং তাঁহার প্রদত্ত হব্য কব্য দেবতা পিতৃগণ কেহই গ্রহণ করেন না;" সুতরাং "শূদ্রাং" ইত্যাদি বাক্যাবলীর দ্বারা তাহার সমর্থন করেন নাই; তবে কামাতুরত্ব প্রযুক্ত উৎপথগমনরূপ যথেচ্ছাচারী হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে, তাই কতকটা বাধা দিয়া তাহার বেগনিবৃত্তির চেষ্টা করা হইয়াছে। উভয়বর্ণের মিশ্রণরূপ বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিল না; কারণ তাহার কুফল যে অতি ভয়ানক হয়, ইহা পরে দেখান যাইতেছে।

মনু বলিয়াছেন—"যত্র ত্বেতে পরিধ্বংসা জায়ন্তে বর্ণদূষকাঃ।
রাষ্ট্রিকৈঃ সহ তদ্রাষ্ট্রং ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি॥"

"যে রাজত্বে বর্ণদূষক বর্ণসংঙ্কর জাতির উৎপত্তি হয়, সে রাজা অচিরাৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।" এই বাক্যটী নিষ্ফল কিংবা ফলপ্রদ তাহা বুদ্ধিমানের বিচার্য্য। সমাজে লোক সংখ্যা বেশী হইবে তজ্জন্য সর্ব্বসাধারণের মিশ্রণে একটী খিচুড়ী জাতি তৈয়ারী করিতে হইবে, ইহা কি বুদ্ধিমানের কথা? হিন্দু জাতির হিন্দুত্ব নষ্ট করিয়া, বর্ণধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিয়া সর্ব্ব-বর্ণের মিলনক্ষেত্র প্রস্তুত করা ঘোর অর্ব্বাচীনতার কাজ। একটী সিংহ বনমধ্যে অবস্থান করিলে শত সহস্র ছাগ পলায়ন করে; সেখানে বহুত্ব দ্বারা লাভ কিছুই হয় না ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। হাজার বর্ষ পূর্ব্বেও ভারত স্বাধীন ছিল, তখন কি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এদেশে ছিল না? যাঁহারা হিউয়েনসাং, ফাহিয়ান প্রভৃতি চীন পরিব্রাজকদিগের লিখিত ভারতের অবস্থা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে সে সময় ভারত কত উচ্চ ছিল। আজ এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধঃপতনের কারণ হইল; ইহা বড় বিস্ময়ের কথা! যেমন স্নায়বিক দুর্ব্বলতাগ্রস্থ রোগী বিজ্ঞাপনে বা চিকিৎসাগ্রন্থে কোন রোগের বর্ণনা দেখিলে নিজেরই হইয়াছে সিদ্ধান্ত করে এবং রোগ নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া বিপরীত ঔষধপথ্যাদি ব্যবহারে তাহার জীবনীশক্তি নষ্ট করিয়া ফেলে, তদ্রূপ হিন্দু জাতির ভীষণ স্নায়ুরোগজনিত অবসাদ তাহার জীবনীশক্তির মূলদেশ পর্য্যন্ত আঘাত করিয়াছে। বিলাতী মাল মসলায় প্রস্তুত ইহকালের ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনাকারকভাবের বা হুজুগের বন্যা এক একবার আসিতেছে এবং সবেগে এই জাতির মূল দেশ পর্য্যন্ত আঘাত করিতেছে। কিন্তু ইহা যে ধ্বংসের নহে! যতই

আঘাত কর না কেন, ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখ—বৌদ্ধধর্ম্মের সাম্য, মৈত্রী, অহিংসা একদিন ভারতের প্রতিপরমাণু পর্য্যন্ত পর্য্যুদস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল—কিন্তু নাশ করিতে সমর্থ হয় নাই। ষোড়শ-বর্ষীয় এক সিংহশিশুর বিরাট হুঙ্কারে ভারত হইতে সে বৌদ্ধরাক্ষস চিরতরে দূরীভূত হইয়াছে—যে প্রশ্ন আজ প্রতি নগরে নগরে উত্থিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা অনেক জটিল কূট সমস্যা উত্থিত হইয়াছিল—তাহার চিহ্নমাত্রও নাই।

প্রকৃতির অবরোহিণী গতির সম্যক্ বাধাদিবার নিমিত্ত কলিযুগ-প্রারম্ভে তাই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মূর্ত্তিমান্ রক্ষক শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে স্বীয় সখা অর্জ্জুনের মুখে বলাইয়াছিলেন—

"সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্যচ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥"

তাঁহার দিব্য দৃষ্টি দেখিয়াছিল ভারতের কি ভীষণ পরিণাম নিকট-প্রায়, তাই সেই মহামনা তারস্বরে বলিয়াছিলেন বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইলে কুল নাশ পাইবে। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিকে কি ইহা দেখাইয়া দিতে হইবে? আজ হিন্দুসন্তান বিলাতী ডুগ্ ডুগীর বাদ্যে কোন্ স্তরে উপনীত হইয়াছে এবং কোন্ দিকে ছুটিয়া চলিতেছে তাহা কি তাহাদের বোধ আছে? বোধ থাকিবে কি করিয়া! চক্ষু হরিদ্রাবর্ণের চশমায় আবদ্ধ, তাই দুনিয়ার প্রতি পরমাণু হলুদের রঙ্গে রঞ্জিত হইয়াছে। ধন্য পাশ্চাত্য জাতি! ধন্য তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি! সামান্য দুইশত বৎসরের আধিপত্যে তোমরা হিন্দু জাতিকে কতটা উদার প্রকৃতিতে লইয়া যাইতেছ! তাহারা আজ এত উদার যে, বিনাযুক্তিতে মাতাকে মাতা

বলিতে চাহেনা ও পিতাকে পিতৃত্বের অধিকার দিতে নারাজ। তাহাদের বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, সব প্রক্ষিপ্তপূর্ণ। তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সব মূর্খ, বুদ্ধিহীন, উন্মাদ ; নতুবা জাতিভেদের এই ঘৃণ্যগণ্ডি এতদিন পর্য্যন্ত মানিয়া আসিতেছিল ! তাহারা এত উদার হইয়াছে যে সাহেবী রং ঢং আদব কায়দা যে না জানে তাহাকে মানুষ বলিতে চাহে না। ভেদ নীতি পরিহার পূর্ব্বক ভারতীয়দিগের গাত্রের বর্ণ পর্য্যন্ত ইউরোপীয় করিতে পারিলেই উন্নতিটা ষোল কলায় পূর্ণ হইতে পারে ; তজ্জন্য অচিরাৎ একটী রিজলিউসান পাশ করা উচিত।

একজন মুসলমানকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, "তুমি তোমার কোরাণ মান তাহার যুক্তি কি ?" সে বলিবে কোরাণ-তাই তাহাকে মানি তাহার আবার যুক্তি কি ? একজন ক্রীশ্চীয়ানকে যদি বল বাইবেল কেন মান, সে বলিবে "বাইবেল লইয়াই ক্রীশ্চীয়নিটী তাই মানি।" হিন্দুকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় অমনি সে বলিবে "ঐ সব অনুদার অনুন্নত ব্রাহ্মণ জাতির প্রক্ষিপ্ত শাস্ত্র শিক্ষিতসম্প্রদায় কি করিয়া মানিতে পারে ?"

এই সব লক্ষণগুলি যাঁহাদের উন্নতির পরিচায়ক, তাঁহারা বর্ণসঙ্করের পরিণাম কি করিয়া বুঝিবেন ? যাঁহাদের দ্বারা ভূত ছাড়ান যাইবে তাঁহারাই যে ভূতগ্রস্ত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় হইতেই ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূলপ্রায় হইয়াছিল। তপঃবিঘ্ননিবারণকারী ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস হওয়ায় ব্রাহ্মণ তপস্যাচ্যুত হইয়া শিখা-সূত্র-জীবী হইতে আরম্ভ করিল। বৈশ্যগণ রক্ষক অভাবে বিদেশ হইতে ধনসংগ্রহে অসমর্থ হইয়া পরস্পর হিংসা, দ্বেষ এবং জুয়াচুরিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। অবশিষ্ট শূদ্রগণ রক্ষক, পোষক এবং জ্ঞানদাতার অভাবে নাসিকায় তৈল প্রবেশ করাইয়া মহানিদ্রায় নিদ্রিত হইল। সুযোগ বুঝিয়া অনার্য্য

জাতীয় দস্যুগণ দেশে উপস্থিত হইল এবং লুণ্ঠন, বন্ধন ও রক্তের সহিত মিশ্রণ করিয়া বেদ পুরাণে প্রক্ষিপ্ত প্রবেশ করাইতে লাগিল, কারণ আপনাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপাদন না করিতে পারিলে তখনও সমাজে বিশেষ সুবিধা হইত না। তখন হইতেই বর্ণসঙ্করের মহিমা ফুটিয়া উঠিল। মৃত্যুর পর কিছু অবশিষ্ট থাকে এ চিন্তা ক্রমশঃ অনার্য্য রক্ত এবং শিক্ষার সংমিশ্রণে সন্দেহের স্থল হইয়া পড়িল, যাহার ফলে আজ ব্রাহ্মণ সন্তানও তাহার পিতৃপিতামহের তর্পণ, মরা গরুকে ঘাস খাওয়ান বলিয়া স্থির করিয়াছে। সুতরাং পিণ্ডোদকক্রিয়া লোপ পাওয়ায় ধীরে ধীরে সেই সব মহামনা উন্নতপ্রাণ সর্ব্বত্যাগী ঋষিদিগের শুভাশীষ আর তাঁহাদের সন্তানেরা প্রাপ্ত হয় না। দেবতাগণ অখাদ্য কুখাদ্যের ভয়ে পালাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছেন। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান আসিয়া আঠে পিঠে চাপিয়া ধরিয়াছে। তাহার ফলে বাপ, মা, যুবা বৃদ্ধ, বালক, স্ত্রী, পুরুষ, হিন্দু, মুসলমান সকলে এক নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনায় রত হইয়াছে এবং বিরাট ব্রহ্ম জাতিতে পরিণত হইতেছে। ইহাই বর্ণসঙ্করেব পরিণাম। সকলেই জানেন যে, মনুষ্য জাতি ভিন্ন নিম্ন জাতিতে বর্ণসঙ্করসৃষ্টি বেশীদূর অগ্রসর হয় না। গাধা এবং ঘোড়ার মিশ্রণে খচ্চর উৎপন্ন হয়। কেহ শুনিয়াছেন কি খচ্চরের বংশ চলিয়াছে? খচ্চরের প্রায়ই গর্ভ হয় না, যদি হয়, প্রসব কালেই তাহার নাশ হয়। বৃক্ষের মধ্যেও কোন এক জাতীয় বৃক্ষের সহিত অন্য জাতীয় বৃক্ষের কলম প্রস্তুত করিলে তাহার গতিও ঐখানেই শেষ। মানুষেও তাহাই; বর্ণসঙ্করজাতি নষ্ট হয় বা অন্য জাতিতে মিলিয়া যায়। কারণ উহা প্রকৃতি মাতার অভিপ্রেত নহে। তাই উহার গতি অতি অল্পেই অবসান হয়।

কুল নষ্ট হইলে ধর্ম্ম নষ্ট হয়, তাহার দৃষ্টান্ত কাহারও অবিদিত

নহে। বর্ণসঙ্কর দ্বারা শ্রাদ্ধ পিণ্ডাদি চলে না, কারণ তাহার রক্তের সহিত, তাহার সূক্ষ্মদেহের সহিত পূর্ব্ব পিতা, পিতামহাদির কোন সম্বন্ধ থাকে না। সুতরাং তাহার উচ্চারিত মন্ত্রাদি কোন ক্রিয়াই উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। অধিকাংশ স্থলে বর্ণসঙ্করগণ পরলোকের অস্তিত্বেই বিশ্বাস করে না, সুতরাং তাদৃশী শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইবারও অবকাশ হয় না। শ্রদ্ধাবিহীন ক্রিয়াকাণ্ড সমুদয়ই বিফল। শ্রাদ্ধ ক্রিয়া অতি মহান্ এবং ব্যাপক। প্রতি দেশেই ইহা কোন না কোন আকারে বর্ত্তমান আছে। হিন্দুরা পিতৃপিতামহাদির প্রতি যতটা কৃতজ্ঞ, অন্য কোন জাতি ততদূর নহে। যাহাদের পূর্ব্ব ইতিহাস উজ্জ্বল নহে তাহারা সমাজে উন্নত হইতে বিশেষ কষ্ট পায়। ঐ ক্রিয়া তাঁহাদের সহিত আমাদের নিত্য সম্বন্ধ সূচনা করাইয়া দেয় এবং ক্রমশঃ উন্নতির পথে চালিত করে, তজ্জন্যই পিতৃপিতামহের জলপিণ্ডাদির ব্যবস্থা আছে; তাহা ছাড়া উহাতে আধ্যাত্মিক কতটা উন্নতি হয় তাহা সময়ান্তরে উল্লেখ করা যাইবে।

অনেকে বলেন যে অন্যান্য দেশে কর্ম্মের দ্বারা ক্ষত্রিয়ত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতেছে, সুতরাং আমাদের দেশেও তাহাই হউক, এই প্রকার জন্মগত জাতি মানিবার আবশ্যকতা নাই। তাঁহাদিগের নিকট বক্তব্য এই যে, জাতির মৌলিকত্ব কাহারও কৃত নহে তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে এবং নিজেরা সুবিধামত জাতি বিভাগ করিয়া লইয়াছে ইহাও অত্যন্ত অসমীচীন কথা; কারণ সাধারণ দৃষ্টিতেই আমরা দেখিতে পাই যে, সকলেই প্রভুত্ব চায় ও কেহ নীচ কার্য্য করিতে রাজী হয় না; সুতরাং যদি সকলকে সমবেত করিয়া বলা হয় যে, আমি ব্রাহ্মণ হই, তুমি ক্ষত্রিয় হও, সে বৈশ্য হউক বা শূদ্র হউক ইহা কোন যুগেই কেহই শুনিবে না। যে ব্রাহ্মণ জাতি প্রভুত্ব করিয়াছিল, তাঁহাদের

সম্বল ছিল কৌপীন ও বনের ফলমূল। রাজ্য বা ধন জন তাঁহারা কিছুই চান নাই ভোগও করেন নাই। বর্ত্তমান সমাজে কেহ কি সেইরূপ সর্ব্বত্যাগী হইতে রাজী হন? যদি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন তাহা হইলেও ভোগের মধ্যে যোগের পতাকা উড়াইয়া বেড়ান এবং পিতৃপুরুষদিগের পিণ্ডপাত করিতে থাকেন। সুতরাং লৌকিক দৃষ্টান্তেও তাহা সিদ্ধ হয় না।

তাহা ছাড়া কর্ম্মগত গুণ আলোচনা করিয়া যে জাতিত্ব সিদ্ধ হয় না এবং উহা যে একেবারেই অসম্ভব ইহা শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা বুঝান যাইতেছে।

আজকাল ঔপনিষদপ্রমাণ স্বীকার করা একজাতীয় হুজুগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং তাহাদ্বারাই প্রমাণিত করা যাইবে যে শুধু কর্ম্মজ্ঞানাদি দ্বারা জাতি নির্ণীত হয় না।

উপনিষদের মধ্যে ১২ বা ৩২ খানা প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। তন্মধ্যে বৃহদারণ্যক এবং ছান্দোগ্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং উৎকৃষ্ট বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করেন।

ছান্দোগ্য বা বৃহদারণ্যক পাঠে তাঁহারা জ্ঞাত হন যে, অনেক ক্ষত্রিয়রাজার নিকট পঞ্চাগ্নিবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা ব্রাহ্মণেরা জানিয়াছিলেন এবং অনেকের এরূপ মত যে ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মবিদ্যা জানিতেনই না; তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডেই রত ছিলেন এবং ক্ষত্রিয়েরা জ্ঞানকাণ্ডের অধিকারী ছিলেন। ইহার মীমাংসা যাহাই হউক তাঁহাদের বাক্যেই শুধু গুণের দ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয় এরূপ প্রমাণ তাঁহারা দিতে পারিলেন না; কারণ সেই সব জ্ঞানী ক্ষত্রিয়রাজগণ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইতেন এমন কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না বা তাঁহারা দিতে অক্ষম। তাহা ছাড়া জীবের

মৃত্যুর পর গতিবর্ণনোপলক্ষে ছান্দোগ্যোপনিষদ্ (৫ম অধ্যায় দশম খণ্ড) বলিতেছেন—

"তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাসো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বাথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাসো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চাণ্ডালযোনিং বা।" ৩৬৫ ॥ ৭ ॥

'তাঁহাদের, সেই সমস্ত অনুশয়িগণের (চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তিগণের) মধ্যে যাঁহারা ইহলোকে রমণীয় বা পুণ্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন তাঁহারা অবিলম্বে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি উৎকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। আর যাঁহারা তাহা না করিয়া কেবল পাপের অনুষ্ঠানই করিয়াছিলেন তাঁহারাও তৎক্ষণাৎ কুকুর, শূকর, চণ্ডাল প্রভৃতি হীন যোনিতেই জন্মগ্রহণ করেন।'

ইহাই ত সরল ব্যাখ্যা। বেদের পুরুষসূক্তে "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ" ইত্যাদি ঋক্ সমাজশরীরের বর্ণনা বা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিলেন, এবার ছান্দোগ্য উপনিষদে মৃত্যুর পর পুণ্য বা পাপফলে যে পুনরায় ব্রাহ্মণযোনি ইত্যাদিতে জন্ম হয় বলিয়া উল্লিখিত আছে ইহা কি রূপক না প্রক্ষিপ্ত, বা গুণ ব্রাহ্মণের যোনি বলিয়া মনে করেন? যোনি শব্দের দ্বারাই যে স্থূল শরীরের উৎপত্তিস্থান বুঝাইতেছে; সুতরাং গুণব্রাহ্মণের যোনি হইলেও পুনরায় জ্ঞানগত ব্রাহ্মণত্ব বা কর্ম্মগত ক্ষত্রিয়ত্ব থাকিল না; সুতরাং বলিতে হইবে ব্রাহ্মণের লিখিত শাস্ত্র কিছুই মানিনা বা নিজেরা যাহা বুঝি তাহাই করিব, তাহা হইলেই আমরাও নিশ্চিন্ত হইয়া বলিতে পারি—"শূন্য গোয়াল ভাল, তবু দুষ্ট বলদ কাজের নয়।"

চতুর্থ অধ্যায়।

শুধু কর্ম্মের উপর বর্ণব্যবস্থা মানিলে কি প্রকার উৎপাত হয় শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা তাহা দেখান যাইতেছে। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে প্রকৃতি ত্রিবিধ ও তাহার গুণ ক্রিয়াদিও ভিন্ন ভিন্ন; সুতরাং একই প্রকার কর্ম্ম সকলের পক্ষে সম্ভব নহে, কারণ গুণগুলি মিশ্রিত হইয়া বা পৃথক্ পৃথক্ রূপে সকলেরই কারণদেহরূপে অবস্থান করিতেছে। তারপর ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির গতি অনুসারে কলিযুগে তমোগুণেরই রাজত্ব, তজ্জন্য তমোগুণ প্রতিঅণুপরমাণু আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তজ্জন্য প্রারব্ধ সংস্কার কাহারও উচ্চ থাকিলেও প্রকৃতির পরিণামে পড়িয়া তাহাকে প্রতিমুহূর্ত্তে পর্য্যুদস্ত হইতে হইতেছে। তাহা ছাড়া মহাভারত শান্তিপর্ব্ব বলিতেছেন।

"বালো যুবা চ বৃদ্ধশ্চ যৎকরোতি শুভাশুভম্।
তস্যাং তস্যানবস্থায়াং তৎফলং প্রতিপদ্যতে॥"

"বাল্য, যৌবন বা বার্দ্ধক্যে যে সমুদয় শুভ বা অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, সেই সেই অবস্থাতেই তাহার ফলভোগ হইয়া থাকে।" তজ্জন্য সর্ব্বাবস্থায় একই প্রকার সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক কর্ম্মে মানব রত থাকিবে ইহা সম্ভবপর নহে। সাধারণতঃ আমরা তাহাই দেখিতে পাই; যে আজ তামসিক, কাল সে মহাসত্ত্বগুণী হইয়া গেল, যে সত্ত্বগুণী সে হয়ত রজোগুণের কার্য্য কাম ক্রোধে মজিয়া গেল এবং যে আজ

মহাজ্ঞানী সে হয়ত পশুতে পরিণত হইল। তুলসীদাস ও বিল্বমঙ্গলের মত কামুক লোকও জগৎপাবন হইয়াছেন। এইসব দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষের প্রকৃতি অনবরত পরিবর্ত্তনশীল এবং তাহা পূর্ব্ব সংস্কারানুযায়ী ত্রিগুণের তারতম্য অনুসারে হইয়া থাকে। মানুষের স্বতন্ত্রতাও প্রায়ই সংস্কারের অনুগামী। যদি পূর্ব্বসংস্কার স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলেও শিক্ষাসংসর্গাদির ফল অবশ্যই মানিতে হইবে। কর্ম্মক্ষেত্র বহুদূর ব্যাপী সুতরাং আজকাল শিক্ষা বা উদরভরণ নিমিত্ত নানাদেশ ভ্রমণ করিতে হয় ও বহুলোকের সহিত মিশিয়া নিত্য নূতন নূতন শিক্ষা ও সংস্কার গ্রহণ করিতে হয়; অধিকন্তু অর্থকরী বিদ্যার সহিত সদাচার, ধর্ম্ম ইত্যাদির কোন প্রকার সম্বন্ধ না থাকায় মানুষ প্রায়ই তমোগুণাত্মক অসদাচার এবং অধর্ম্মে আসক্ত হইয়া হিংসা, অনৃত প্রভৃতি আত্মনাশকর ব্যাপারে রত হয়। এইসব কারণে মানব সাধারণের এক প্রকার কর্ম্মে রত থাকিবার কোন সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রতি মুহূর্ত্তেই মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন সহকারে কর্ম্মের পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী। কর্ম্মজনিত গুণ বা গুণজনিত কর্ম্মদ্বারা ইহজন্মেই যদি সকলেই ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি বর্ণে উন্নত হইবে অথবা বৈশ্যশূদ্রাদিবর্ণে অবনত হইবে এইরূপ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সমাজ, শাস্ত্র, বর্ণ ইত্যাদি স্বীকারের আর কোন যৌক্তিকতা থাকে না; অধিকন্তু উহাতে মূঢ়তা ও বিচারশীলতার ন্যূনতা পরিলক্ষিত হইবে। কারণ যদি কর্ম্মের দ্বারা বর্ণতা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে মানবমাত্রই জন্মতঃ চতুর্বর্ণের বাহিরে ম্লেচ্ছ বা অন্য কিছু হয় ইহা মানিয়া লইতে হইবে। এখন জন্মতঃ সকলেই ম্লেচ্ছ স্বীকার করা গেল। একজন নিজের চেষ্টাফলে ২০ বৎসরে শূদ্রত্ব বা বৈশ্যত্ব লাভ করিল—এখন বিবাহ করিবে কাহার

কন্যাকে ? কারণ সকল কন্যাই জন্ম হইতে ম্লেচ্ছ। যে নিজে শূদ্র বা বৈশ্য হইয়াছে এখন তাহার সংস্কার দৃঢ় রাখিবার নিমিত্ত তজ্জাতীয়া কন্যার সহিত বিবাহ হওয়া প্রয়োজন, নতুবা নীচসংসর্গ হেতু পারিবারিক কলহ বা সঙ্কর বর্ণের উৎপত্তি হইয়া পিতৃপুরুষের পিণ্ড লোপ পাইবে। কিছুদিনপর সেই ব্যক্তি দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিল বা নিজের দুর্দ্দশা দেখিয়া ধ্যান ধারণায় রত হইয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিল ; এখন তাহার পত্নী কি করিবে ? সে বৈশ্য বা শূদ্রজাতীয়া তখনও হয় নাই বা হইয়াছে। নিজে ব্রাহ্মণ হইলেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার বংশের সমস্তগুলি সেই কর্ম্ম করে না বা করিবে না। এরূপ স্থলে সেই নীচজাতীয় পত্নীপুত্রের সহিত তাহার সংসর্গ করা উচিত নহে ; তাহার পত্নীরও ঐ ব্রাহ্মণপতি ত্যাগ করতঃ কোন বৈশ্য বা শূদ্র পতির আশ্রয় লইতে হয়, নতুবা ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যার বা শূদ্রার সংসর্গবশতঃ আর একটী সঙ্করজাতির উৎপত্তির সম্ভাবনা হইবে। ভাগ্যক্রমে সেই ৪০ বা ৫০ বৎসরে উপনীত গুণ-ব্রাহ্মণমহাশয়ের পিতা মাতা তখনও বর্ত্তমান আছেন। তাঁহারা বৈশ্য বা শূদ্রই রহিলেন। এখন পুত্র গুণে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন সুতরাং অন্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেন, তজ্জন্য পিতা মাতার উচিত যে সেই গুণধর পুত্রকে প্রাতে উঠিয়াই প্রণাম করেন। কারণ ব্রহ্মজ্ঞানী সকলেরই নমস্য। শাস্ত্র বলেন—

"ইমং লোকং মাতৃভক্ত্যা পিতৃভক্ত্যা তু মধ্যমম্।
গুরুশুশ্রূষয়াত্বেব ব্রহ্মলোকং সমশ্নুতে॥
অভিবাদনশীলস্য নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনঃ।
চত্বারি সম্প্রবর্দ্ধন্তে আয়ুর্বিদ্যা যশো বলম্॥" মনুসংহিতা

"পিতা মাতা এবং আচার্য্য সকলেরই প্রণম্য সুতরাং তাঁহাদের প্রণাম দ্বারা আয়ু, বিদ্যা বল ও যশ বৃদ্ধি হয় এবং ইহপরলোকে বিশেষ সুখ প্রাপ্তি হয়।" এখন ব্রহ্মজ্ঞানী পুত্রমহাশয় কি করিবেন? তিনি অর্দ্ধচন্দ্র প্রদানপূর্ব্বক বৃদ্ধ বৈশ্য পিতামাতাকে গৃহ হইতে বাহির করিবেন অথবা তাঁহাদের সম্মাননা করিবেন? এইত লৌকিক পরিণাম!

শাস্ত্রদৃষ্টিতে আলোচনা করিলে আরও বিপদ, কারণ জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত যতগুলি সংস্কার ব্রাহ্মণাদির বর্ত্তমান আছে তাহার মূলোচ্ছেদ না করিলে অর্থাৎ দেশশুদ্ধ সকল জাতিকে এক বিরাট ব্রাহ্মজাতিতে পরিণত না করিলে গুণব্রাহ্মণাদি শুধু ঠাকুরমার গল্প হইয়া পড়ে। কারণ ব্রাহ্মণাদির নামকরণ উপনয়ন বিবাহ ইত্যাদি সকল কর্ম্মেরই বৈদিক ধর্ম্মানুযায়ী সময় এবং মন্ত্রাদি নির্দ্ধারিত আছে। ধরুন একজন জন্মম্লেচ্ছ ৬০ বৎসরে ব্রাহ্মণবর্ণে উন্নত হইলেন, তখন তাহার নামকরণ হইবে? বা তারপর অন্নপ্রাশনের ব্যবস্থা করিতে হইবে? তাহার উপনয়ন সংস্কারইবা কি প্রকারে হইবে? কারণ শাস্ত্র বলেন—

> "গর্ভাষ্টমেঽব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনয়নম্।
> গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞো গর্ভাত্তু দ্বাদশে বিশঃ॥" মনুসংহিতা

"গর্ভ হইতে অষ্টম বৎসর বয়সে ব্রাহ্মণের উপনয়ন হইবে, গর্ভ হইতে একাদশে ক্ষত্রিয়ের এবং গর্ভ হইতে দ্বাদশ বর্ষে বৈশ্যের উপনয়ন হইবে।" এস্থলে কি সেই দিন তাহার জন্ম ধরিয়া লইতে হইবে? তাহার শ্রাদ্ধাদি কে করিবে এবং কিরূপে হইবে? শাস্ত্রানুযায়ী অনুলোমবিবাহ থাকিলেও নীচবর্ণজাতস্ত্রীর পুত্র শ্রাদ্ধাদিপিতৃকার্য্যের অধিকারী হয় না অথচ শ্রাদ্ধ হিন্দুর নিত্যকর্ম্ম। সে ব্রাহ্মণ হইলে তাহার রক্ত যতদূর

প্রসারিত, সকলেরই সেইরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি তাহা স্বীকার করা গেল তবে জন্মব্রাহ্মণত্বই একরূপ স্বীকৃত হইয়া গেল।

এইরূপ বহু প্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারা কর্ম্মে বা গুণে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তির যে যুক্তি তাহার অসারতা প্রতিপাদন করা যাইতে পারে; যদি কাহারও বুঝিবার ইচ্ছা বা সামর্থ্য থাকে, তাহার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। নতুবা তিনি বলুন আমি শাস্ত্র বা যুক্তি কিছুই মানি না, তাহা হইলে আমরা তাঁহার গুণগ্রাম অবগত হইয়া দূরে অবস্থান করিতে পারি। যদি বেদ স্মৃতি কি কোন ধর্ম্মশাস্ত্র মানিতে হয় তাহা হইলে জন্মগত বর্ণত্ব স্বীকার করিতে হইবে; গুণগত স্বীকার করিলে উহা বন্ধ্যাপুত্রের মত অসৎ হইয়া পড়িবে। আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি জগতে একজাতি বা একবর্ণ কিছুই নাই; সুতরাং এক বা সাম্যবাদের ধূয়াতে জগৎ নাচাইতে পারিলেও প্রকৃতির বিরুদ্ধ কাজ করিলে প্রকৃতিমাতারূপিণী মহামায়া অবতীর্ণা হইয়া স্বয়ং তাহার ধ্বংসসাধন করিবেন। তাই তিনি বলিয়াছেন—

"ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহম্ করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্ ॥"

আমার শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে বর্ণ-ধর্ম্ম মৌলিক সুতরাং কালবশতঃ যতই বিপর্য্যয় হউক না কেন ইহার অস্তিত্বনাশ করার সামর্থ্য কাহারও নাই বা হইবে না। জন্মগতবর্ণত্বই স্বীকার্য্য এবং গুণগত বর্ণত্ব বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অলীক। সুতরাং প্রত্যেক বর্ণের স্বকর্ম্ম দ্বারাই তাহার উন্নতি সম্ভবনীয়। গীতাও তাহাই বলিয়াছেন—"স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।" 'অর্থাৎ স্বীয়

স্বীয় বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মদ্বারাই মানুষ সিদ্ধিলাভ করে।' ইহাই বৈদিক সিদ্ধান্ত।

এখন কয়েকটী প্রশ্নের উদয় হইতে পারে যে (১) সমাজে অনেক তথাকথিত নীচজাতীয় ব্যক্তিদিগের ভিতরে উচ্চবর্ণের ক্রিয়াকলাপ দেখিতে পাওয়া যায় এবং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদির ভিতরেও বহু অপকর্ম্মা অত্যচারী লোক দেখিতে পাওয়া যায় ইহার কারণ কি? (২) উচ্চ বর্ণের পক্ষে সমুদয় সুবিধা পাইয়া যদি এত নীচ হওয়া সম্ভব হয় তাহা হইলে নীচবর্ণ সেই সুবিধাগুলি পাইলে নিশ্চয়ই তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারিবে। (৩) যখন নীচকর্ম্মরত ব্রাহ্মণাদি বর্ত্তমান আছে, তখন উচ্চকর্ম্মরত শূদ্রাদি তাহাদের সমকক্ষ বা তদপেক্ষা কেন শ্রেষ্ঠ হইবে না? ইহার যথাসম্ভব উত্তর দেওয়া যাইতেছে—

(১) চারিটী কারণে উচ্চজাতির মধ্যে নীচকর্ম্মপরায়ণ এবং নীচ জাতির মধ্যে উচ্চকর্ম্মপরায়ণ মানব দেখিতে পাওয়া যায়। (ক) বর্ণ-সঙ্করতা, (খ) আরূঢ়পতন, (গ) কুশিক্ষা ও (ঘ) যুগধর্ম্ম।

(ক) পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ক্ষত্রিয়কুলের প্রায় সর্ব্বনাশ হয়, সুতরাং বর্ণাশ্রম রক্ষা করিবার উপযুক্ত রাজশক্তি রহিল না, এবং অনার্য্য যোদ্ধজাতি আসিয়া ক্ষত্রিয়নামগ্রহণপূর্ব্বক সমাজে প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণজাতি তপস্যারক্ষার অনুকূলতা না পাইয়া ক্রমশঃ তপঃশক্তিহীন হইতে লাগিলেন, অথচ পূর্ব্ববৎ মর্য্যাদা পাইয়া মত্ততা-প্রযুক্ত নানাপ্রকার ব্যভিচারে রত হইলেন। তারপর কৌলীন্যমর্য্যাদার অযথা ব্যবহারে সমাজে আর এক ভয়ানক ব্যভিচারের পথ প্রশস্ত হইয়া গেল সুতরাং তাহাদের গৃহে সঙ্করপুত্রাদি উৎপন্ন হইয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু মূলে উৎপত্তির অশাস্ত্রীয়তা প্রযুক্ত শাস্ত্রকর্ম্মে তাহাদের বিশ্বাস রহিল না। পরবর্ত্তী বৌদ্ধরাজগণের

নানাপ্রকার চেষ্টাতেও অনেক প্রকারে বৈদিক ধর্ম্মের হানি হয় এবং বর্ণাশ্রমের উপর ভীষণ আঘাত পড়ে। মুসলমানপ্রাধান্যেও কতকটা তাহা হইয়াছিল ও অনেক স্থলে যৌন সম্বন্ধও বিগড়াইয়া যায়; তজ্জন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে আস্থা কতকটা শিথিল হইয়া পড়ে। তজ্জন্য ব্রাহ্মণ জাতির ভিতরে অনেক নীচকর্ম্মা জন্মিয়াছে এবং নীচ জাতির ভিতরে উচ্চ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(খ) বিদুরের মত অনেক মহাত্মাই স্বীয় কর্ম্মফলে শাপবশতঃ অথবা মৃত্যুকালীন কোন নীচজনোচিত বাসনার প্রাবল্যে নীচ জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। প্রমাণ স্বরূপ রাজা ভরতের হরিণযোনিপ্রাপ্তি এবং পুরঞ্জনের স্ত্রীত্বপ্রাপ্তি উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাও ঐরূপ কর্ম্মব্যতিক্রমের অন্যতম কারণ বলা যায়। শাস্ত্রও ইহার সমর্থন করেন। যথা—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥" গীতা

"অর্থাৎ যে মৃত্যুকালে যে ভাব স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করে সে তজ্জাতীয়ত্ব লাভ করে।" সূক্ষ্ম শরীর বা মনের উৎকট আকাঙ্ক্ষাই এতাদৃশ দেহগ্রহণের কারণ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে। ফল কথা, সূক্ষ্মদেহের ভাবনা বশতঃই স্থূলদেহপ্রাপ্তি হয় তজ্জন্য উচ্চকর্ম্মরত উত্তম বর্ণের ব্যক্তিগণ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত হীনবাসনার ক্ষয়ের নিমিত্ত নিম্নবর্ণে জন্মগ্রহণ করেন।

(গ) কুশিক্ষার ফল ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান দাড়াইয়াছে। জাতীয়তা বা ধর্ম্মশিক্ষা স্কুল কলেজে নাই। কোন উপায়ে কিঞ্চিৎ

ইংরাজী শিক্ষা করিয়া দাসত্ব বা ব্যবসায়নামীয়প্রতারণা দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া পড়িয়াছে। বাল্যকাল হইতেই প্রত্যেকেই শুনিতে পাইলেন যে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ অসভ্য, অর্দ্ধউলঙ্গ জাতি ছিলেন, তাঁহাদের বেদ কতকগুলি কৃষকের গান; পুরাণগুলি ঠাকুরমার ঝুলি, জাতিভেদ ব্রাহ্মণঠাকুরের কাঁচকলা আদায়ের ফন্দি; শালগ্রাম—পাথর, গঙ্গাজল সাধারণ জলতুল্য, তীর্থাদি পাণ্ডাদের অর্থ উপার্জ্জনের যুক্তি, সাধুগুলি সমাজের আবর্জ্জনাস্বরূপ, স্ত্রীজাতি পুত্র-উৎপাদনের যন্ত্র, পিতামাতা জ্ঞানশূন্য অসভ্য, পুত্রস্নেহ মমতার আবর্ত্ত, প্রভূভক্তি—দাসত্ব, শিক্ষকতা অর্থাগমের উপায়, ছাত্রের বিদ্যাগ্রহণ অর্থের বিনিময়, পতিপত্নীর ভালবাসা সৌন্দর্য্যের বিনিময়—ইত্যাদি।

এই সমুদয় বাল্যকাল হইতে মস্তিষ্কের অন্তর হইতে অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিল। বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে করিতেই রেনল্ডসাহেবপ্রমুখ বিদেশী মহাত্মা এবং ভজহরি দাস প্রমুখ এদেশী মহাত্মাদিগের লেখনী-নিঃসৃত উপন্যাসসমূহ পূর্ব্বকালীন দ্বিজাতির গায়ত্রী জপের ন্যায় সর্ব্বজাতির হৃদয়স্থ হইয়া পড়িয়াছে; বিনোদিনীর সহিত গুপ্তপ্রেম নানা প্রকার অবৈধমৈথুনের জ্বালায় সপ্তমবর্ষীয় বালকের শরীর পর্য্যন্ত অসার হইয়া গিয়াছে; সুযোগ বুঝিয়া ধাতুপুষ্টির নিমিত্ত মুর্‌গীর ঝোল, মটনের হালুয়া, বোতলবাহিনী প্রভৃতির দয়ায় দেশকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবার নিত্য নূতন ফন্দি সর্ব্বত্র প্রচার হইতেছে।

কলির চরগণ স্বামী, ব্রহ্মচারী, পরমহংস, অবধূত, অবতার প্রভৃতি নামধারণ করতঃ পুস্তিকা, পত্রিকাও প্রচারক দ্বারা সস্তায় ব্রহ্মজ্ঞান ও বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির সন্ধান বিলাইতেছেন, যাহার ফলে এযুগে আর সাধন ভজনেরও প্রয়োজন নাই—কেবল কর্ম্মার্পণ বা শরণাপন্ন হইলেই সর্ব্ব-কার্য্যার্থসিদ্ধি হইতেছে। তাই বর্ণাশ্রম, দেশ, জাতি সব একাকার হইয়া

পড়িয়াছে। একটী কথা মনে পড়িল, একদিন স্বনামধন্য পণ্ডিত প্রমথ-নাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের সহিত কথা হইয়াছিল। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে যখন তিনি কাশীতে শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসজীর নিকট বেদান্ত পড়িতেন সেই সময় কঠোপনিষদের "শতঞ্চৈকা হৃদয়স্য নাড্যা" ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিয়া তিনি হাসিয়াছিলেন, তজ্জন্য পরমহংসজী উত্তেজিত হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহার ভাবার্থ এইরূপ—হাজার বৎসরের মুসলমানশিক্ষার ফলে দেশ যতটা নষ্ট না হইয়াছিল, দেড়শত বৎসর ইংরাজী শিক্ষায় তদপেক্ষা শতগুণ নষ্ট হইয়াছে। তিনি আর সংসারে ফিরিবেন না কিন্তু তর্কভূষণ মহাশয়কে আরও অনেকবার আসিতে হইবে ইত্যাদি।

বাস্তবিকই আমরা কি হইলাম ভাবিলে রক্ত শুকাইয়া যায় তবে ভরসা কেবল পার্থসারথির সেই বাক্য—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

(ঘ) যুগধর্ম্মের প্রাধান্য ইহার মধ্যে বিশেষ বিবেচনার বিষয়। কারণ তমোগুণের সম্পূর্ণ বিকাশক্ষেত্র কলিযুগ। পুরাণও সংহিতাতে কলির ব্যবহার অনেক বর্ণিত আছে কিন্তু অনেকে তন্ত্রের প্রাধান্য দেখাইয়া অনাচারের সমর্থন করেন তজ্জন্য মহানির্ব্বাণতন্ত্র হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতেছে যথা—

"আয়াতে পাপিনি কলৌ সর্ব্বধর্ম্মবিলোপিনি।
দুরাচারে দুষ্প্রপঞ্চে দুষ্টকর্ম্মপ্রবর্ত্তকে॥ ৩৭

ন বেদাঃ প্রভবস্তত্র স্মৃতীনাং স্মরণং কুতঃ।
নানেতিহাসযুক্তানাং নানামার্গপ্রদর্শিনাম্ ॥ ৩৮
বহুলানাং পুরাণানাং বিনাশোভবিতা বিভো।
তদা লোকা ভবিষ্যন্তি ধর্ম্মকর্ম্মবহির্ম্মুখাঃ ॥ ৩৯
উচ্ছৃঙ্খলা মদোন্মত্তাঃ পাপকর্ম্মরতাঃ সদা।
কামুকা লোলুপাঃ ক্রূরা নিষ্ঠুরা দুর্ম্মুখাঃ শঠাঃ ॥ ৪০
স্বল্পায়ুর্ম্মন্দমতয়ো রোগশোকসমাকুলাঃ।
নিঃশ্রীকা নির্ব্বলা নীচা নীচাচারপরায়ণাঃ ॥ ৪১
নীচসংসর্গনিরতাঃ পরবিত্তাপহারকাঃ।
পরনিন্দাপরদ্রোহপরিবাদপরাঃ খলাঃ ॥ ৪২
পরস্ত্রীহরণে পাপশঙ্কাভয়বিবর্জ্জিতাঃ।
নির্দ্ধনা মলিনা দীনা দরিদ্রাশ্চিররোগিনঃ ॥ ৪৩
বিপ্রাঃশূদ্রসমাচারাঃ সন্ধ্যাবন্দনবর্জ্জিতাঃ।
অযাজ্যযাজকা লুব্ধা দুর্ব্বৃত্তাঃ পাপকারিণঃ ॥ ৪৪
অসত্যভাষিণো মূর্খা দাম্ভিকা দুষ্টপ্রপঞ্চকাঃ।
কন্যাবিক্রয়িনো ব্রাত্যা স্তপোব্রতপরাঙ্মুখাঃ ॥ ৪৫
লোকপ্রতারণার্থায় জপপূজাপরায়ণাঃ।
পাষণ্ড-পণ্ডিতম্মন্যাঃ শ্রদ্ধাভক্তিবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৪৬
কদাহারাঃ কদাচারা ভৃতকাঃ শূদ্রসেবকাঃ।
শূদ্রান্নভোজিনঃ ক্রূরা বৃষলীরতিকামুকাঃ ॥ ৪৭
দাস্যন্তি ধনলোভেন স্বদারান্ নীচজাতিষু।
ব্রাহ্মণ্যচিহ্নমেতাবৎ কেবলং সূত্রধারণম্ ॥ ৪৮
নৈব পানাদিনিয়মো ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিবেচনম্।
ধর্ম্মশাস্ত্রে সদা নিন্দা সাধুদ্রোহো নিরন্তরম্ ॥ ৪৯

"এই পাপময়কলি দুরাচার, দুষ্টকর্ম্মপ্রবর্ত্তক, এবং সংসারে বিষম বিপর্য্যয় সংঘটন করে। এই কলিযুগে বেদের কিছুমাত্র প্রভাব থাকিবে না। স্মৃতি স্মৃতিপথের অতীত হইবে। বহুবিধ ইতিহাসসংযুক্ত নানাবিধ সাধনপন্থাপ্রদর্শক বিস্তীর্ণ পুরাণসংহিতাও বিনষ্ট হইয়া যাইবে সুতরাং এসময় লোকসকল ধর্ম্মকর্ম্মে বিমুখ হইয়া পড়িবে। এই কলিযুগের লোকেরা সর্ব্বদা পাপকর্ম্মেনিরত, অনিয়ন্ত্রিত, মদোদ্ধত, কামমোহিত, দুর্ম্মুখ, লুব্ধ, ক্রূর, নিষ্ঠুর ও শঠ হইবে। ইহারা স্বল্পায়ু রোগশোক সমাকুল, শ্রীহীন, দুর্ব্বল, ম্লেচ্ছ যবন প্রভৃতি নীচজাতির আচার ব্যবহারে রত ও নীচাশয় হইবে। কলিযুগের লোকেরা খলস্বভাব, নীচজাতির সংসর্গে সদানিরত, পরধনাপহারী, পরনিন্দাপরায়ণ, পরদ্রোহকারী ও পরগ্লানিতে রত হইবে। পরস্ত্রীহরণে ইহাদের কিছুমাত্র পাপাশঙ্কা বা ভয় থাকিবে না। ইহারা প্রায়ই নির্ধন, মলিন, দীন দুঃখিত ও চিররোগী হইবে। কলিযুগের ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের ন্যায় আচারসম্পন্ন, সন্ধ্যা-বন্দনবর্জ্জিত, অযাজ্যযাজী লোভী, দুর্বৃত্ত ও পাপকারী হইবে। এই সকল ব্রাহ্মণগণ অসত্যভাষী, মূর্খ, দাম্ভিক, অতিশয় প্রবঞ্চক, কন্যাবিক্রয়ী, ব্রাত্য ও তপোব্রতপরাঙ্মুখ হইবে। কলিতে পাষণ্ড, পণ্ডিতম্মন্য ও শ্রদ্ধাভক্তি বিবর্জ্জিত ব্রাহ্মণগণ কেবল লোকদিগকে প্রতারিত করিবার জন্যই জপ ও পূজার অনুষ্ঠান করিবে। ইহারা কদর্য্য আহার করিবে, ও কদর্য্যব্যবহারে রত হইবে। এই সকল ব্রাহ্মণ ক্রূর, অন্যের গলগ্রহ, শূদ্রসেবক, শূদ্রান্নভোজী ও শূদ্রপত্নী-গমনে লোলুপ থাকিবে। ইহারা অর্থলোভে নীচ জাতীয় লোক-কেও নিজধর্ম্মপত্নী প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। ইহাদের ব্রাহ্মণজাতির চিহ্নের মধ্যে কেবল গলদেশে সংস্কৃত বা অসংস্কৃত সূত্রমাত্র থাকিবে। ইহাদের ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচার বা পানাদির নিয়ম

কিছুই থাকিবে না। ইহারা ধর্ম্মশাস্ত্রের নিন্দা ও নিরন্তর সাধুগণের অনিষ্টাচরণ করিবে।"

এই সমুদয় ধীরভাবে আলোচনা করিলে সমুদয় অন্যায়ের কারণ স্পষ্টই অনুভব করা যাইবে। ইহাতে একটী প্রশ্ন হইতে পারে—তবে আর আমাদের করিবার কিছুই নাই কারণ কলির প্রভাবেই যখন সমুদয় হইতেছে তখন বৃথাচেষ্টার ফলও বৃথা; কিন্তু তাহা নহে। চোরের কাজ চুরি করা; গৃহস্থের কাজ যথাসম্ভব সাবধান হইয়া তাহার বাধা দেওয়া; সুতরাং কলিরূপী চোর সজ্জনের গৃহে যতই চুরি করিয়া ধর্ম্মহানির চেষ্টা করুকনা কেন, তাহার উপযুক্ত প্রতীকার করাই সাধুর একমাত্র করণীয়; তাই যুগপ্রভাবে যত প্রকার অনিষ্টাচরণের আশঙ্কা থাকুকনা কেন, তাহার সহিত আজীবন সংগ্রাম করিয়া যথা সম্ভব উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাতে যতটুকু সাফল্য লাভ করা যায় তাহাই আকাঙ্ক্ষনীয়।

জ্ঞানলাভে স্ত্রী শূদ্র প্রভৃতি সকলেরই অধিকার আছে, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায় এবং তদনুকূল বহু দৃষ্টান্তও আছে, কিন্তু অনেকে তাহাতে বলেন, 'তবে আর ব্রাহ্মণত্বের বড়াই করা কেন? বরং অন্যের বড়াই করাই উচিত কারণ তাহাদের সুবিধা না থাকাতেও উন্নত হইয়াছে।' ইহা অত্যন্ত অযৌক্তিক; কারণ পিতা হইতে পুত্র সময় বিশেষে শ্রেষ্ঠ হয় কিন্তু তাহাতে পিতার পিতৃত্বরূপ শ্রেষ্ঠত্বের অপলাপ হয় না। তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেও জ্যেষ্ঠত্ব এবং আজীবনকালসাধনার সফলতা নিরাস করিবার উপায় নাই। তদ্ভিন্ন উচ্চাবস্থা হইতে পতনের ফলে যাঁহারা স্ত্রী শূদ্র দেহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এইরূপ প্রমাণ শাস্ত্রাদিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মজ্ঞান সাংসারিক বস্তুর সহিত এক নহে। সংসারে যাহার বিদ্যা, বুদ্ধি এবং ক্ষমতার (অনিমাদি) আধিক্য আছে সেই পূজনীয় হয়। ব্রাহ্মণেতর অন্য দেহে তাহা দেখিতে

পাওয়া যায় না সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্নও ব্রাহ্মণ্য আকাঙ্ক্ষনীয় বস্তুই থাকে। বিদ্যা বলিতে অর্থকরী বিদ্যা বুঝিলেই বিপদ হইবে, তাহাতে বরং অন্তজাতিরই শ্রেষ্ঠ হওয়া বাঞ্ছনীয়; কারণ আজীবন তাহারা তাহারই সাধনা করিয়া আসিতেছে।

ভগবান্ বিষ্ণু রাম ও কৃষ্ণরূপে ক্ষত্রিয়কুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তজ্জন্য অনেকের আক্ষেপোক্তি শুনিতে পাওয়া যায় যে, ক্ষত্রিয় নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি; সুতরাং শ্রেষ্ঠত্ব ও নিকৃষ্টত্বের মাপকাঠি প্রথমে স্থির করা প্রয়োজন। বিষ্ণুর অবতার ধর্ম্মসংস্থাপনের এবং অধর্ম্মনাশের নিমিত্ত। ক্ষত্রিয়রাজাই ধর্ম্মের পোষক এবং অধর্ম্মের নাশক এবং ধর্ম্মশক্তিও রাজঅনুগামী। এখনও তাহার প্রকৃষ্টপ্রমাণ পাওয়া যাইতেছে; অল্প সময়েই কেমন আমরা নিজেদের পিতৃপিতামহের নাম ভুলিতে বসিয়াছি, ইহা দেখিলেই রাজার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারি। সেই রাজধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্য-তপস্যার দ্বারা বর্দ্ধিত হয়। ভগবান্ রামচন্দ্র বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ ও সুতীক্ষ্ণ-মুনির নিকট সেই শক্তিলাভ করেন; এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সান্দীপনি, এবং দুর্ব্বাসা মুনির নিকট প্রাপ্ত হন। ইহাই পুরাণাদির উক্তি সুতরাং শ্রেষ্ঠত্ব নিকৃষ্টত্বাদি ইহার দ্বারাই বিচার্য্য।

(২) শাস্ত্র এবং যুক্তিদ্বারা দেখান গিয়াছে যে স্থূল সূক্ষ্ম কারণ ত্রিবিধ দেহের পুষ্টি দ্বারা বা গুণ, কর্ম্ম ও জ্ঞান তিনের সম্যক্‌পুষ্টি দ্বারা এক বর্ণ অন্য বর্ণে উন্নত হয়, এবং বর্ণভেদ শুধু গুণগত নহে, জন্মগত; সুতরাং নীচবর্ণের কেহ কর্ম্মে বা জ্ঞানে উন্নত হইলে পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারিবেন না—যতক্ষণ না তিনি তপস্যার বলে তাঁহার দেহ পর্য্যন্ত প্রকৃতির ক্রিয়ার বাহিরে লইয়া যাইতে সমর্থ হন। ইহা প্রায় অসম্ভব; আম্র বৃক্ষে ফল ধরুক বা না ধরুক, বীজের গুণে আম্র ভিন্ন নিম্ব কোনও কালেই হইবে না,—যদি তাহার আমূলসংস্কার না

সম্ভব হয়। সুতরাং ঐরূপ সাম্যবাদ ঘৃণ্য। এতদ্ভিন্ন উহাতে সমাজস্থিতি একবারেই অসম্ভব। পারিবারিককলহ, পরস্পর হিংসাদ্বেষ, নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি এবং পুরাতনের বিরোধ, অধিকারানুযায়ী কার্য্যাদি সমুদয় এককালে নষ্ট হইয়া যাইবে।

(৩) পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে গুণগত জাতিত্ব অসম্বন্ধপ্রলাপ এবং জীবন্তব্যভিচারের কারণ এবং সমাজে তাহা কোনরূপেই সম্ভব নহে সুতরাং ঐরূপ শূদ্র ব্রাহ্মণ, বা ব্রাহ্মণ শূদ্র হইতে পারে না। কর্ম্মগতহীনতা থাকিলে তজ্জন্য সম্মান না থাকিতে পারে, কিন্তু জাতিগতউচ্চতার মৌলিকতা নষ্ট হইবে না। যেমন আম্রবৃক্ষ, কুল হইতে শ্রেষ্ঠ, ইহার মধ্যে একে ফলশূন্য হইলেও অপরের স্বজাতীয় হইবার কারণ কিছুই নাই। তাহাছাড়া একটী ব্যভিচার অন্য ব্যভিচারের দ্বারা নিবৃত্ত হয় না। হাতে বিষ্ঠা লাগিলে মূত্র দ্বারা শোধিত হয় না তাহার জন্য পরিষ্কৃত জলের ব্যবস্থাকরা প্রয়োজন হয়। তদ্রূপ সমাজে একজন কর্ম্মে হীন হইলে তাহার কাণ ধরিয়া অন্য-জাতিতে প্রেরণ করা যায় না এবং অন্যযুগেও কখন এইরূপ হয় নাই। কর্ম্মের পার্থক্য দেখাইয়া অত্রিমুনি দশপ্রকার ব্রাহ্মণের উল্লেখ করিয়াছেন। যদি কাহারও উন্নতি অভীপ্সিত হয়, তবে যাহাতে সেই কর্ম্মগুলি শুদ্ধ হয় বা উচ্চদেহধারণের উপযুক্ত গুণলাভ হয় তন্নিমিত্ত চেষ্টাকরাই বুদ্ধিমানের কাজ।

বর্ণধর্ম্ম সম্বন্ধে শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা কতকটা আলোচনা করা গেল, এখন জ্ঞানশিক্ষার জন্য শাস্ত্রকারব্রাহ্মণেরা যে সকলকেই সমান সুযোগ দিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। যাঁহারা বলেন, বেদের বহু পরে পুরাণতন্ত্রাদির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদের মত কতকাংশ সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। কারণ পুরাণাদি যে পূর্ব্বেও বর্ত্তমান

ছিল, তাহা উপনিষদাদি পাঠে অবগত হওয়া যায়। প্রমাণস্বরূপ ছান্দোগ্য উপনিষদের কিছু উল্লেখ করা যাইতেছে যথা—

'অধীহি ভগব ইতি হোপসসাদ সনৎকুমারং নারদস্তং হোবাচ যদ্বেত্থতেন মোপসীদ ততস্ত ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামীতি"

এক সময়ে নারদঋষি মহাযোগী সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"ভগবন্! অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করুন।" সনৎকুমার নারদের এই প্রার্থনা শুনিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা তুমি কোন্ কোন্ বিষয় অবগত আছ তাহা আগে আমাকে জানাও তাহার পর তোমাকে উপদেশ দিতেছি।"

স হোবাচ ঋগ্বেদং ভগবোহধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্বনং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমবেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং বেদবিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পজনবিদ্যামেতদ্ভগবোহধ্যেমি। ২ সপ্তম অধ্যায়—

নারদ বলিলেন, 'প্রভো! আমি ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ পঞ্চমবেদস্থানীয় ইতিহাস ও পুরাণসমূহ ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধপদ্ধতি, গণিত বিদ্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি অমঙ্গলের কালনির্ণায়ক শাস্ত্র, পৃথিবীর নিম্নস্থিত রত্ননির্ণয়ের শাস্ত্র তর্কশাস্ত্র, বেদাঙ্গ পঞ্চভূত নির্ণায়ক শাস্ত্র, ধনুর্ব্বেদ, গারুড়তন্ত্র ইত্যাদি অধ্যয়ন করিয়াছি।'

ইহার মধ্যে পুরাণ ইতিহাসের বিষয়ও উল্লেখ আছে সুতরাং তৎসময়েও ঐসব বিদ্যমান ছিল জানা যায়। তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে বা কলির বিদ্যায় অনেক অসম্ভবপদার্থ প্রবিষ্ট হইয়াছে ইহাই প্রকৃতকথা। অধুনা ভারতধর্ম্মমহামণ্ডল হইতে 'দৈবীমীমাংসা দর্শন' নামে একখানি নূতন দর্শনশাস্ত্রই আবিষ্কৃত হইয়াছে সুতরাং পূর্ব্বেও এইরূপ অনেক হইয়াছে তাহা স্বচ্ছন্দে বলিতে পারা যায়। যাহাই হউক, পুরাণ

তন্ত্র মধ্যে সমুদয় বৈদিক কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ড সন্নিবেশিত আছে এবং সকলেরই তাহাতে সমান অধিকার দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা উপনিষদ্, গীতা, পুরাণ ও তন্ত্র পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা ইহার সাক্ষ্য দিতে পারেন যে, যাহা উপনিষদ তাহারই সার গীতা এবং উপনিষদের অদ্বৈত জ্ঞান ও উপাসনাপ্রণালী পুরাণতন্ত্রাদিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বরং বৈদিক-মন্ত্রাদির সাধনপ্রণালী যতই দুরূহ, পুরাণ তন্ত্রাদির সাধনপ্রণালী ততই সুগম। সমস্ত বঙ্গদেশে বৈদিকআচারযুক্ত কয়টী ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়? সকলেই তন্ত্রের মন্ত্রাদিতে দীক্ষিত, সমস্ত যোগপ্রণালী তন্ত্র শাস্ত্রানুমোদিত। প্রতিপূজারম্ভেই ভূতশুদ্ধি দ্বারা অদ্বৈতবাদের সার্থকতা সম্পাদন করা হয়। স্বীয় হৃদয় হইতে দেবতাকে আবাহন করিয়া সম্মুখ-বর্ত্তী কোন আধারে স্থাপিত করা হয় এবং পুনরায় নিজদেহে স্থাপন করা হয়; সুতরাং তন্ত্রাদিতে অধিকার থাকা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ কাহাকেও কিছু শিক্ষা দেয় নাই, এরূপ বলা ভয়ানকদ্বেষবুদ্ধি ও ধৃষ্টতার পরিচায়ক এবং ইহা পাশ্চাত্য জাতি কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হিন্দুজাতি নষ্ট করিবার, হিন্দু-শক্তি ছিন্ন ভিন্ন করিবার জন্য ভীষণ ভেদনীতি—যাহার ফলে দেশ আজ তীব্রবেগে ধ্বংসের মুখে ছুটিয়া যাইতেছে। বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ না করিয়া, আজীবনকাল ভীষণ কঠোরতায় নিষ্পেষিত না হইয়া, আহারনিদ্রাদি সংযমের পরাকাষ্ঠা না করিয়া যদি সুলভে মন্ত্রশক্তিসাহায্যে বা যৌগিক ক্রিয়ার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করা যায় তাহাই কি বাঞ্ছনীয় নহে? বরং ইহাতে ব্রাহ্মণজাতির পরজাতিনিষ্পেষণবুদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারশক্তি এবং অধিকারিনির্ণয়ের অপূর্ব্বপ্রতিভাই পরিলক্ষিত হয়।

তান্ত্রিকমন্ত্রের দ্বারা যাহা সিদ্ধ হয়, তাহাকি কেহ জ্ঞাত আছেন বা তাহা সিদ্ধ করিবারই ক্ষমতা কাহারও আছে? যদি থাকিত, তবে কেহই

এইরূপ অসম্বন্ধ প্রলাপ বকিতেন না যে, দেবতাবিশ্বাস করিবার প্রয়োজন আদৌ নাই, মন্ত্র কিছুই নহে ইত্যাদি।

তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য যদি ব্রহ্মজ্ঞান হয় এবং সমুদয় কর্ম্মকাণ্ড যদি তাহাতে লক্ষিত হয়, তবে আর ব্রাহ্মণের অত্যাচার না বলিয়া বালকের প্রতি মাতার স্নেহ বলিলেই ভাল হইবে অথবা পরমহংসদেবের কথায় বলিলেই হইবে 'যাহার যা পেটে সয়, মা তাহার জন্য তাহারই ব্যবস্থা করেন' ইহাই মাতার মাতৃত্ব। এখন দুটী জিনিষের রাজত্ব সমাজে চলিতেছে। একটী যোগ ও অপরটী ব্রহ্মজ্ঞান—একটী সিদ্ধগুরু আমদানি করিয়া তাহার কৃপায় সিদ্ধযোগ অবলম্বন করা, অপরটি ব্রহ্মজ্ঞানী সর্ব্বভূক্তে সমভক্ষণকারী মহাত্মার কৃপায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা ইহাই বর্ত্তমানকালের আবহাওয়া। ইহা যে কতটা অযৌক্তিক তাহা তন্ত্রশাস্ত্র আলোচনায় দেখান যাইতেছে। কারণ, তন্ত্রের নাম লইয়াই যত অনাচার এবং ব্রহ্মজ্ঞানের ছড়াছড়ি হইয়াছে। তাই উহার প্রকৃততত্ত্ব জানিতে পারিলেই সর্ব্বপ্রকার সন্দেহ এককালে দূরীভূত হইবে। শূদ্রের উপর অযথা অত্যাচার হয় নাই তাহাও বুঝা যাইবে ও ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে নিরাকার সগুণব্রহ্মবাদী হইবার সম্ভাবনাও থাকিবে না।

পঞ্চম অধ্যায়।

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই তিনতত্ত্বই সমুদয়সাধনার ভিত্তি এবং ত্রিতত্ত্বজ্ঞানেই তাহার পরিসমাপ্তি। ইহার মধ্যে জ্ঞাতা কর্ত্তা, জ্ঞেয়কর্ম্ম এবং জ্ঞান করণ। জ্ঞাতা আমি বা জীব, জ্ঞেয় ব্রহ্ম বা শিব, জ্ঞান তাহার নিমিত্ত নানাপ্রকার সাধন। আমি বা জীব সুখদুঃখভোগী সংসারী, ব্রহ্ম বা শিব নিরাকার নির্গুণ বা সাকার সগুণ ; জ্ঞান শৈব বৈষ্ণবাদি নানা প্রকার পথ।

বৈদিকমতানুযায়ী অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্য, কঠোর সংযম ইত্যাদি দ্বারা গুরুগৃহে বাসকরতঃ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হয়, বর্ত্তমানে তাহা নাই। পৌরাণিক বা তান্ত্রিক মন্ত্রে—যন্ত্রাদির সহায়তার সগুণব্রহ্মরূপে তাঁহার উপাসনা এবং চরমে নির্গুণে অবস্থিতি করা যায়।

বর্ত্তমানে আরও অন্যান্য মতে জ্ঞানলব্ধ হয় শুনা যায়। সমুদয় বৈদিক বা তান্ত্রিকমত শুদ্ধ নহে, তজ্জন্য নিরাকার সগুণ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করাই একমাত্র পন্থা বলিয়া তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার প্রমাণস্বরূপ তাঁহারা শাস্ত্র হইতে বলেন—

"চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপকল্পনা॥"

অর্থাৎ "চিন্ময়, অপ্রমেয়, নিষ্কল, অশরীরী ব্রহ্মের রূপ সাধকের হিতের নিমিত্ত কল্পিত হইয়াছে।" উহার বাস্তব কোন সত্তা নাই। অপরপক্ষ বলেন উহা ব্রহ্মেরই কল্পিত এবং তিনি সাধকের নিমিত্ত কল্পনা করিয়াছেন।

ব্রহ্মের স্বরূপদর্শী শাস্ত্র বলিয়াছেন—রূপাদিকল্পনা সাধকের হিতের নিমিত্ত ব্রহ্মই করিয়াছিলেন। 'সাধকানাং' এই শব্দে ষষ্ঠীর বহুবচন নির্দ্দিষ্ট আছে, এখানে উহাকে কর্ত্তা সাজাইয়া রূপকল্পনার সহিত অন্বয়করা হইয়াছে, ইহাতেই এত ভ্রান্তি। সাধকানাং শব্দ সম্বন্ধে ষষ্ঠী এবং হিতার্থায় এই পদের সহিত তাহার অন্বয় হইবে এবং ব্রহ্মণ্ শব্দের উত্তর যে ষষ্ঠী আছে তাহাই কর্ত্তায় ষষ্ঠী এবং রূপকল্পনা এই পদের সহিত তাহার অন্বয়।

যদি বলা যায় অর্থ যখন উভয়প্রকারেই করা যায়, তখন তোমার কথা মানিব কেন? তাহার উত্তর শুনিলেই ভ্রম কোথায়, তাহা বাহির হইয়া পড়িবে। যে শ্লোকটীর অর্থ লইয়া এত অশান্তি, তাহা কুলার্ণবতন্ত্রে সাকারউপাসনা উপলক্ষেই লিখিত আছে। বিজাতীয় শিক্ষার গুণে প্রক্ষিপ্তবাদ মজ্জাগত হইয়া পড়ায় এইরূপ বুদ্ধিবিপর্য্যয় হইতেছে।

(১) যদি ঐ শ্লোকের অর্থ বিপরীত করা যায় অর্থাৎ মানুষ রূপকল্পনা করিয়াছে, দেবতা নাই বলা যায়, তবে তাহা শাস্ত্রের বিপরীত হয়।

(২) সাধকগণ নিজ নিজ ইচ্ছা অনুসারে রূপ কল্পনা করিয়া লইলে অসংখ্য মূর্ত্তির উল্লেখ হওয়া উচিত, কারণ অসংখ্যপ্রকার কল্পনা হইবে এবং যদি সেই সমুদয় সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা বাঞ্ছিত হয় তাহা হইলে শাস্ত্রে অসংখ্য উপাস্য মূর্ত্তির ধ্যান ও মন্ত্রাদি লেখা উচিত ছিল।

(৩) মূর্ত্তি কল্পনা যদি আপন আপন অভিপ্রায় অনুযায়ী হয় তাহা হইলে মন্ত্রাদি উপাসনাপ্রণালীও আমার ইচ্ছানুযায়ী কেন হইবে না?

(৪) নিজের ইচ্ছামত আমি যাহা কল্পনা করিব, তাহাতেই ঈশ্বর আবির্ভূত হইবেন ইহা সম্ভব হইলে তাঁহার স্বতন্ত্রতা কোথায়?

(৫) আমার ইচ্ছানুযায়ী হইলে সময়াদিনির্দ্ধারণ আমি নিজেই করিতে পারি সুতরাং শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই।

(৬) আমার শক্তিদ্বারাই যদি মন্ত্রশক্তি পরিচালিত হয় তবে অন্য উপায়েই তাহা করা সম্ভব হইতে পারে।

(৭) নিজের কল্পনাদ্বারাই যদি কার্য্য সিদ্ধ হয় তবে গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা নাই।

(৮) জীবের এমন কি শক্তি আছে যদ্বারা শাস্ত্রীয়সহায়তা-ব্যতিরেকেই সে সিদ্ধ হইতে পারে?

(৯) এরূপ সিদ্ধিলাভ কেহ কখনও কাহারও দেখিয়াছেন অথবা শুনিয়াছেন কি? অর্থাৎ কি বিশ্বাসে মানুষ সেই পথে অগ্রসর হইবে?

(১০) এরূপ সিদ্ধিলাভ করিতে যদি কোন বিপদ্ আসে তাহার জন্য দায়ী কে?

(১১) কত কালে এই সিদ্ধিলাভ হইবে তাহার নিশ্চয় কি?

(১২) মনোময়ীসিদ্ধির জন্য শাস্ত্রের সহায়তা লইবার প্রয়োজন কি?

এই সমুদয় প্রশ্নের মীমাংসা করা চাই, নতুবা ঐরূপ কদর্থ স্বীকৃত হইবে না। বোধোদয়কার লিখিলেন 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ,' অমনি সমুদয় অবোধেরা বুঝিলেন ঈশ্বর তদ্রূপ। ব্রহ্মও ঈশ্বর স্বরূপতঃ এক হইলেও কার্য্যতঃ এক নহেন। কারণ ব্রহ্ম নির্গুণ, ঈশ্বর সগুণ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী; ব্রহ্ম নিরাকার নিষ্ক্রিয়, ঈশ্বর সাকার সৃষ্টিস্থিতি-সংহার-কর্ত্তারূপে বিরাজমান। কিন্তু কালধর্ম্মে সকলেই নিরাকার সগুণ ঈশ্বর ভজনে পটু হইয়াছেন। শাস্ত্রীয় ঈশ্বর নিরাকার হইতে পারেন না কারণ তাঁহার ঐশ্বর্য্য রহিয়াছে সুতরাং তিনি নির্গুণ নিরাকার হইবেন কি প্রকারে? অভিমানরূপ কর্ত্তৃত্ব না থাকিলে কোন ব্যাপার তাঁহাদ্বারা সম্পাদিত হয় না। আর অভিমান স্বীকার করিলেই তাঁহার মন বা অন্তঃকরণ আছে স্বীকার করিতে হইবে; অন্তঃকরণ দেহ ব্যতিরেকে সিদ্ধ হয় না, সুতরাং ঈশ্বরের দেহ আছে স্বীকার করিতে হয়। তাই তিনি

সাকার। তিনি যদি সাকার না হন তাহা হইলে সাকার আসিল কোথা হইতে? বলিতে পার সাকার হইলেই তিনি বদ্ধ হইলেন, ক্ষুদ্র দেহ দ্বারা তাঁহার অনন্তত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব ধর্ম্ম নিশ্চয়ই ব্যাহত হইল সুতরাং তিনি সাধারণ জীব হইলেন। বাস্তবিকই কি তাহাই? তাহা নহে, কারণ সাধারণ দেহধারী ত্রৈলিঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দ প্রভৃতি যোগীগণের যে ক্ষমতা লোকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে তাহাত উপকথা নহে। যদি তাঁহাদেরই ঐরূপ শক্তি এই ক্ষুদ্র দেহদ্বারা অর্জ্জিত হইতে পারে, তবে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমানের পক্ষে ইহা কি অসম্ভব! যাঁহার প্রসাদে জীব সর্ব্বশক্তি ধারণ করিতে পারে, ত্রিগুণের পারে যাইয়া নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বে লীন হইতে পারে, তিনি কি স্বয়ং স্বেচ্ছাক্রমে শরীর ধারণ করিতে পারেন না? তিনি কি মায়ার সর্ব্ববিধ শক্তি আয়ত্ত রাখিয়া দেহ ধারণ করিতে পারেন না? তাহা যদি না পারেন তবে তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলার কি প্রয়োজন তাহা আমাদের ধারণার অতীত।

শাস্ত্র বলিয়াছেন—"যৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তাঃ
যোগপ্রভাববিধূতাখিলকর্ম্মবন্ধাঃ।
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োপি ন নহ্যমানা
স্তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষা কুত এব বন্ধঃ॥" ভাগবত

"যাঁহার চরণ কমলোত্থিত ধূলি সেবনে তৃপ্ত হইয়া এবং যোগপ্রভাবে অখিল কর্ম্ম বন্ধন ত্যাগ করিয়া মুনিগণ স্বচ্ছন্দাচারী হন তাঁহার পক্ষে স্বেচ্ছায় শরীর ধারণ করিলে বন্ধের সম্ভাবনা কোথায়?"

এই অলৌকিকত্ব তাঁহাতে আছে তাই তিনি ঈশ্বর, নতুবা সাধারণ জীবে ও ঈশ্বরে পার্থক্য কোথায়? যদি ঐশ্বর্য্য না থাকে তবে ঈশ্বর

কাঁহাকে বলে? শুধু মাধুর্য্য থাকিলে তাঁহাকে ঈশ্বর না বলাই ভাল, নতুবা অনর্থক শব্দ ব্যবহার হইয়া পড়ে। তাঁহাতে নিরতিশয় ঐশ্বর্য্য স্বতঃসিদ্ধ আছে, তাই তিনি ঈশ্বর।

যথা—"অণিমা মহিমা মূর্ত্তে র্লঘিমা প্রাপ্তিরিন্দ্রিয়ৈঃ।
প্রাকাম্যং শ্রুত-দৃষ্টেষু শক্তিপ্রেরণমীশিতা॥
গুণেম্বসঙ্গো বশিতা যৎকাম স্তদবস্যতি।
এতা মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টৌ চৌৎপত্তিকীর্ম্মতাঃ॥ ভাগবত

"অণিমা (অণুত্ব), মহিমা (মহত্ত্ব), লঘিমা (লঘুত্ব), প্রাপ্তি (ইন্দ্রিয়রূপে সর্ব্বজীবের জ্ঞান রূপী), প্রাকাম্য (শ্রুত এবং দৃষ্ট সমস্ত বিষয়ের ভোগ), ঈশিতা (শক্তি প্রেরণ), বশিতা (ত্রিগুণে নির্লিপ্ততা), কামাবসায়িতা (কামনামাত্রই তাহার সিদ্ধি) এই আটটী ঐশ্বর্য্য যাহাতে আছে তিনি কি নিরাকার নির্গুণ—এ ঠিক কাঁঠালের আমসত্ত্ব নহে কি?"

ভগবদ্‌গীতা বলেন—"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরংভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥"

"মানুষ দেহধারী আমার পরম ভাব না জানিয়া মূঢ়গণ সর্ব্বভূত মহেশ্বর আমাকে অবজ্ঞা করে।" বেদান্তমতেও এই ঈশ্বর তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। যাহারা বলেন বেদান্তে ঈশ্বর স্বরূপ কিছু বর্ণিত হয় নাই, তাঁহাদের বোধ-হেতু তাহা উল্লেখ করা যাইতেছে।

"চিদানন্দময়ব্রহ্মপ্রতিবিম্বসমন্বিতা।
তমোরজঃসত্ত্বগুণা প্রকৃতি র্দ্বিবিধা চ সা॥

সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্যে চ তে মতে।
মায়াবিম্ব বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ।
অবিদ্যাবশগস্ত্বন্য স্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা॥" পঞ্চদশী

"সত্ত্ব-রজ-তমোগুণময়ী প্রকৃতি দ্বিবিধা, মায়া এবং অবিদ্যা। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণময়ী প্রকৃতি মায়া নামে অভিহিত এবং অবিশুদ্ধ সত্ত্বগুণময়ী অবিদ্যা নামে অভিহিত। মায়ার স্বরূপ এক সুতরাং তাহাতে প্রতিফলিত চিৎও এক, তিনি ঈশ্বর নামে অভিহিত এবং অনেকরূপে বিভক্ত অবিদ্যাতে প্রতিফলিত চিৎ বহু জীব নামে অভিহিত। ঈশ্বর মায়া বশীভূত করিয়া মায়ার সাহায্যে অঘটন ঘটন করিতেছেন এবং জীব অবিদ্যার বশীভূত হইয়া মায়ার অধীন হইয়া পড়িয়াছে।"

এইত বেদান্তের কথা, তাহাতেও বিশ্বাস নাই বা বুঝিবার সামর্থ্য নাই। তাহা হইলে তুমি যে বল, 'নিরাকার ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, আমার উপরে তাঁহার অনন্ত দয়া'। আমি বলিব তোমার বাক্যের প্রমাণ কি? বরং তোমার কথার বিরুদ্ধে যতগুলি বলিতে পারি আগে তাহার উত্তর দাও। ঈশ্বর এজগৎ কেন সৃষ্টি করিলেন? তোমাকে আমাকে বা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করায় তাহার স্বার্থ কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে তোমার সমুদয় মত বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়া পড়িবে তাইরে নারে ভিন্ন আর উপায় থাকিবে না। কোন উত্তর দিতে না পারিলেই হয় তোমাকে নাস্তিক হইতে হইবে, নতুবা বলিতে হইবে তিনি কোন স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি স্বার্থসিদ্ধি স্বীকার কর তবে 'স্ব' থাকিলেই 'পর' আছে সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব্বেই কতকগুলি 'পর' ছিল সেই 'পর' গুলি কাহারা? আর যদি পর থাকে তবে তিনি অদ্বিতীয় এক হইলেন কিরূপে? আর সেই পরকেই বা কে সৃষ্টি করিল? তাহা

হইলে আর একজন সৃষ্টিকর্ত্তা চাই। যদি তিনি নিজেই করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি এরূপ নির্ব্বোধের ন্যায় একটী শত্রু (সয়তান) করিলেন কি প্রকারে? তাঁহার সৃষ্টি করারই বা কি স্বার্থ ছিল? তিনি যদি নিঃস্বার্থ কর্ত্তা হন তবে আমাদিগকে এত স্বার্থপরের ন্যায় সৃষ্টি করিলেন কেন? তাঁহার স্বার্থ বা নিঃস্বার্থ যাই থাকুক না কেন, আমি এত যন্ত্রণায় মরি কেন? তিনি কি শক্তিমান্ বলিয়া আমার উপর এত অত্যাচার? তাই যদি হয়, তবে তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা কোথায়? তিনি যদি পরম দয়াল প্রেমময়, তবে আমি এত যন্ত্রণা পাই কেন? যদি কর্ম্মের ফল হয়, তবে আমাকে এ কর্ম্মের প্রবৃত্তি দিল কে? সকলের কর্ত্তা হইলেন তিনি, কর্ম্ম গাছ হইতে পড়িল নাকি? সেও তাঁহারই দয়া যাহার ফলে আমি কুপথে যাই আর তিনি বলেন—'যাও কেন'? এইবার তোমার কি কি যুক্তি আছে বাহির কর এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা আমার এইগুলি খণ্ডন কর; যদি তাহা না পার তবে লৌকিক দৃষ্টিদ্বারা এবং দৃষ্টান্ত লইয়া তাঁহাকে ওজন করার চেষ্টা কেন? এবং সেই দৃষ্টান্ত সহায়তায় তিনি অনন্ত অপরিসীম সুতরাং সীমাবদ্ধ বস্তুর মধ্যে যাইতে পারেন না এরূপ বল কেন? তুমি যদি দৃষ্টান্ত দিতে না পারিয়া নিরাকারের স্কন্ধে এতগুলি গুণ আরোপ করিতে পার তবে সাকার স্বীকার করিতে তোমার এত আপত্তি কেন? ক্ষুদ্র আধারে বৃহৎ আধেয় তোমার মতে থাকে না; তবে যেখানে আধার একেবারেই নাই, তাহার স্কন্ধে তোমার বিদ্যা প্রকাশের সুযোগ পাইল কি প্রকারে?

শাস্ত্র বলেন—"অপাণিপাদো জবনগ্রহীতা।
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ॥
স বেত্তি বিশ্বং নহি তস্য বেত্তা।
তমাহুরাগ্র্যং পুরুষং প্রধানম্॥"

"পাণি হীন হইয়াও তিনি শীঘ্র গ্রহণকারী, পাদবিহীন হইয়াও অতি দ্রুতগামী, চক্ষুহীন হইয়াও তিনি দেখিতেছেন, কর্ণহীন হইয়াও তিনি শ্রবণ করিতেছেন, তিনি বিশ্বের সমুদয়ই জানেন কিন্তু তাঁহাকে কেহই জানে না। তাঁহাকেই শাস্ত্র আদি এবং প্রধান পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন।"

ইহাদ্বারা কি ইহাই বুঝিলে যে তিনি চক্ষু না থাকিলেও দর্শন করেন, কর্ণ না থাকিলেও শ্রবণ করেন? তবে ত বিদ্যার দৌড় বুঝিতে পারা গেল। কারণ, করণ ভিন্ন ক্রিয়া কেহ কখনও দেখিয়াছে কি? কারণ নাই তাহার কার্য্য আছে এ যে বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অসৎ অর্থাৎ যদি কেহ বলে আমার মাতা বন্ধ্যা তাহা হইলে লোকে তাহাকে পাগল ভিন্ন আর কি বলে? সুতরাং এইরূপ অসম্বদ্ধ প্রলাপ বুদ্ধিমানের উক্তি নহে। ঐ শ্লোকের অর্থ উহা নহে। যাহাদের চক্ষু কর্ণ আছে তাহারাই উহার অর্থ ঐরূপ বুঝিতে পারে কিন্তু তিনি যে দেশ কালের অতীত এবং জগতের জ্ঞাতা, এখানে তাঁহাকে বেত্তা বলা হইয়াছে। তাঁহার চক্ষু না থাকিলেও তিনি দেখিতে পান ইত্যাদি বলা উদ্দেশ্য হইলে 'নহি তস্য দ্রষ্টা' 'নহি তস্য শ্রোতা' ইত্যাদি বলিতেন কিন্তু সর্ব্বশেষে নহি তস্য বেত্তা বলায় ইহাই বুঝা গেল যে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষদ্বারা তোমার আমার যে জ্ঞান জন্মে সেই ইন্দ্রিয়গুলি না থাকিলেও তাঁহার সমুদয় জ্ঞান নিত্য বিরাজিত রহিয়াছে। তজ্জন্যই তাঁহার জ্ঞাতা কেহ নাই ইহাই বলা হইয়াছে। তিনি সকলকে জানেন, তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না ইহাই এ শ্লোকের তাৎপর্য্য; নতুবা চক্ষু না থাকিলেও দর্শন করেন ইহার অর্থ কিছুই হয় না।

যদি বল পরিচ্ছিন্ন আকারে অনন্ত শক্তি থাকিতে পারে না তাহাদ্বারা কি বুঝিব? আমি তাঁহার যতটুকু আকৃতি দিই বা যে ক্ষুদ্র চক্ষু দিই তাহা তোমার অভিপ্রেত নহে; তুমি তাহা অপেক্ষা অনেক বড় আকৃতি দিতে চাও তাঁহাকে অনেক বড় দেখিতে চাও; তাহা হইলে আমা

অপেক্ষা তোমাকে আরও বড় সাকারবাদী বলিব। তোমার বাসনাও আগ্রহ আরও বলবৎ। এই বলবতী আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যই ভক্ত ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বমূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিলেন যথা—

অর্জ্জুন উবাচ—

"এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপ মৈশ্বরং পুরুষোত্তম॥
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতিপ্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্॥"

ভগবান্ উবাচ—

"নতু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥"

সঞ্জয় উবাচ—

"এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্॥"

অর্জ্জুন বলিলেন—"হে ভগবন্! তুমি তোমার স্বরূপ যাহা বলিলে সবই সত্য। তোমার সেই পরম বিভূতিময় রূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা করি; সুতরাং যদি আমাকে উপযুক্ত মনে কর তবে হে যোগেশ্বর! তোমার সেই উত্তম আত্মস্বরূপ একবার আমাকে দেখাও।"

ভগবান্ বলিলেন—"তোমার এই স্বচক্ষু (স্থূলচর্ম্মচক্ষু) তাদৃশ রূপ দর্শন করিতে অসমর্থ সুতরাং তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিতেছি, আমার যোগৈশ্বর্য্য দর্শন কর। এই বলিয়া মহাযোগেশ্বর হরি তাহাকে পরম ঈশ্বর-রূপ দর্শন করাইলেন।"

ভক্তের প্রতি তিনি করুণাপরবশ হইয়া অনেক স্থানে তাঁহার বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়া ছিলেন। এখন যদি তাঁহার বিরাট বিশ্বরূপের কেহ দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন তিনিও তাহাতে সমর্থ হন এবং হইতেছেন সুতরাং আধার আধেয় লইয়া এত বুদ্ধি বিভ্রম কেন? জড়জগতের বেত্তা বৈজ্ঞানিকগণও প্রমাণিত করিয়া ফেলিলেন যে একবিন্দু ধূলিকণার ভিতরে অনন্ত অসীম শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে যদ্বারা জগতের ধ্বংস বা উৎপত্তি সম্ভব হয় আর তাঁহাদেরই বিদ্যায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া তোমরা বিশ্বাস করিতে পার না, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়!

একটী গল্প মনে পড়িয়া গেল। এক অর্থলোভী গুরু একজন দস্যুকে মন্ত্র দিলেন, বলিলেন "গুরুরেব সদাগতিঃ" এই মন্ত্র জপ করিতে থাক। গুরুর আশা এই যে ইহার অর্থ বোধ হইলেই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে এবং তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থ দিবে। সুতরাং তিনি মধ্যে মধ্যে শিষ্যের কুশলাদি জানিতে আসিতেন একদিন দেখিলেন গুণধর শিষ্য স্বীয় দস্যু-বৃত্তির ফলে এক অভিনব অর্থ আবিষ্কার করিয়াছে। 'গুরুরেব সদা গতিঃ স্থলে গুরুরে, বস, দাগতিঃ এইরূপ পদ ব্যবচ্ছেদ করিয়াছে। শুনিয়াই গুরুদেব দাগতির ভয়ে তথা হইতে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন। আমাদের শাস্ত্রকারদিগের দুর্দ্দশাও প্রায় তাহাই। মুদ্রাযন্ত্রের বাহুল্যে অসংযমীর হাতে শাস্ত্র পড়িয়া কি ভীষণ দুর্দ্দশা হইয়া পড়িয়াছে তাহার প্রমাণ দেখাইতেছি—

তন্ত্রচতুর্দ্দশোল্লাস—মহানির্ব্বাণ

শ্রীদেব্যুবাচ—

"যত্তকস্মাদ্দেবতানাং পূজাবাধো ভবেদ্ বিভো।
বিধেয়ং তত্র কিং ভক্তৈ স্তন্মে কথয় তত্ত্বতঃ॥ ৯৫॥

অপূজনীয়াঃ কৈর্দ্দোষৈ র্ভবেয়ুর্দ্দেবমূর্ত্তয়ঃ।
ত্যাজ্যা বা কেন দোষেণ তদুপায়শ্চ ভণ্যতাম্ ॥ ৯৬

শ্রীসদাশিব উবাচ—

"একাহমর্চ্চনাবাধে দ্বিগুণং দেবমর্চ্চয়েৎ।
দিনদ্বয়ে তদ্দ্বিগুণং তদ্দ্বিগুণ্যং দিনত্রয়ে ॥ ৯৭
ততঃ ষন্মাসপর্য্যন্তং যদি পূজা ন সম্ভবেৎ ॥
তদাষ্টকলসৈর্দ্দেবং স্নাপয়িত্বা যজেৎসুধীঃ ॥ ৯৮
ষণ্মাসাৎ পরতো দেবং প্রাক্‌সংস্কার-বিধানতঃ।
পুনঃ সুসংস্কৃতং কৃত্বা পূজয়েৎ সাধকাগ্রণীঃ ॥ ৯৯
খণ্ডিতং স্ফুটিতং ব্যঙ্গং সংস্পৃষ্টং কুষ্ঠরোগিনা।
পতিতং দুষ্টভূম্যাদৌ ন দেবং পূজয়েদ্ বুধঃ ॥ ১০০
হীনাঙ্গং স্ফুটিতং ভগ্নং দেবং তোয়ে বিসর্জ্জয়েৎ।
স্পর্শাদিদোষদুষ্টঞ্চ সংস্কৃত্য পুনরর্চ্চয়েৎ ॥ ১০১
মহাপীঠে ঽনাদিলিঙ্গে সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতে।
সর্ব্বদা পূজয়েত্তত্র স্বং স্বমিষ্টং সুখাপ্তয়ে ॥ ১০২
যদ্ যৎ পৃষ্টং মহামায়ে নৃণাং কর্ম্মানুজীবিনাম্।
নিঃশ্রেয়সায় তৎসর্ব্বং সবিশেষং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১০৩
বিনাকর্ম্ম ন তিষ্ঠন্তি ক্ষণার্দ্ধমপি দেহিনঃ।
অনিচ্ছন্তোঽপি বিবশাঃ কৃষ্যন্তে কর্ম্মবায়ুনা ॥ ১০৪
কর্ম্মণা সুখমশ্নন্তি দুঃখমশ্নন্তি কর্ম্মণা।
জায়ন্তে চ প্রলীয়ন্তে বর্ত্তন্তে কর্ম্মণো বশাৎ ॥ ১০৫
অতো বহুবিধং কর্ম্ম কথিতম্ সাধনান্বিতম্।
প্রবৃত্তয়েঽল্পবোধানাং দুশ্চেষ্টিত-নিবৃত্তয়ে ॥ ১০৬

যতো হি কর্ম্ম দ্বিবিধং শুভঞ্চাশুভমেবচ।
অশুভাৎ কর্ম্মণো যান্তি প্রাণিন স্তীব্রযাতনাম্ ॥ ১০৭
কর্ম্মণোঽপি শুভাদ্দেবি ফলেষাসক্তচেতসঃ।
প্রযান্ত্যায়ান্ত্যমুত্রেহ কর্ম্মশৃঙ্খলযন্ত্রিতাঃ ॥ ১০৮
যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভং বাশুভমেব বা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্পশতৈরপি ॥ ১০৯
যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি।
তথা বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মভিশ্চাশুভৈঃ শুভৈঃ ॥ ১১০
কুর্ব্বাণঃ সততং কর্ম্ম কৃত্বা কষ্টশতান্যপি।
তাবন্ন লভতে মোক্ষং যাবজ্ জ্ঞানং ন বিন্দতি ॥ ১১১
জ্ঞানং তত্ত্ববিচারেণ নিষ্কামেনাপি কর্ম্মণা।
জায়তে ক্ষীণতমসাং বিদুষাং নির্ম্মলাত্মনাম্ ॥ ১১২
ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।
সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখী ভবেৎ ॥ ১১৩
বিহায় নাম রূপাণি সত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে।
পরিনিষ্ঠিততত্ত্বো যঃ স মুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনাৎ ॥ ১১৪
ন মুক্তির্জপনাদ্ধোমাদুপবাসশতৈরপি।
ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ ॥ ১১৫
আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎ পরঃ।
দেহস্থোঽপি ন দেহস্থো জ্ঞাত্বৈবং মুক্তিভাগ্‌ভবেৎ ॥ ১১৬
বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বং নামরূপাদি কল্পনং
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তো নাত্রসংশয়ঃ ॥ ১১৭
মনসা কল্পিতা মূর্ত্তি র্নৃণাং চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তদা ॥ ১১৮

মৃচ্ছিলাধাতুদার্ব্বাদিমূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তস্তপসা জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যান্তি তে॥ ১১৯
আহারসংযমক্লিষ্টা যথেষ্টাহার-তুন্দিলাঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানবিহীনা শ্চেন্নিষ্কৃতিং তে ব্রজন্তি কিম্॥ ১২০
বায়ু-পর্ণ-কণা-তোয়-ব্রতিনো মোক্ষভাগিনঃ।
সন্তি চেৎ পন্নগা মুক্তাঃ পশুপক্ষিজলেচরাঃ॥ ১২১
উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমোভাবো বহিঃপূজাধমাধমঃ॥ ১২২
যোগো জীবাত্মনো রৈক্যং পূজনং সেবকেশয়োঃ।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিদুষো ন যোগো ন চ পূজনম্॥ ১২৩
ব্রহ্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং যস্য চিত্তে বিরাজতে।
কিন্তস্য জপযজ্ঞাদ্যৈ স্তপোভির্নিয়মব্রতৈঃ॥ ১২৪
সত্যং বিজ্ঞানমানন্দং একং ব্রহ্মেতি পশ্যতঃ।
স্বভাবাদ্ ব্রহ্মভূতস্য কিং পূজা ধ্যানধারণা॥ ১২৫
ন পাপং নৈব সুকৃতং ন স্বর্গো ন পুনর্ভবঃ।
নাপি ধ্যেয়ো ন বা ধ্যাতা সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জানতঃ॥ ১২৬
অয়মাত্মা সদা মুক্তো নির্লিপ্তঃ সর্ব্ববস্তুষু।
কিং তস্য বন্ধনং কস্মাৎ মুক্তিমিচ্ছন্তি দুর্ধিয়ঃ॥ ১২৭
স্বমায়ারচিতং বিশ্বং অবিতর্ক্যং সুরৈরপি।
স্বয়ং বিরাজতে তত্র হ্যপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্টবৎ॥ ১২৮
বহিরন্তর্যথাকাশং সর্ব্বেষামেব বস্তুনাম্।
তথৈব ভাতি সদ্রূপো হ্যাত্মা সাক্ষী স্বরূপতঃ॥ ১২৯
ন বাল্যমস্তি বৃদ্ধত্বং নাত্মনো যৌবনং জনুঃ।
সদৈকরূপশ্চিন্মাত্রো বিকারপরিবর্জ্জিতঃ॥ ১৩০

জন্মযৌবনবার্দ্ধক্যং দেহস্যৈব ন চাত্মনঃ।
পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি মায়াপ্রাবৃতবুদ্ধয়ঃ॥ ১৩১
যথা শরাবতোয়স্থং রবিং পশ্যত্যনেকধা।
তথৈব মায়য়া দেহে বহুধাত্মানমীক্ষতে॥ ১৩২
যথা সলিলচাঞ্চল্যং মন্যন্তে তদ্‌গতে বিধৌ।
তথৈব বুদ্ধেশ্চাঞ্চল্যং পশ্যন্ত্যাত্মন্যকোবিদাঃ॥ ১৩৩
ঘটস্থং যাদৃশং ব্যোম ঘটে ভগ্নেঽপি তাদৃশম্।
নষ্টে দেহে তথৈবাত্মা সমরূপো বিরাজতে॥ ১৩৪
আত্মজ্ঞানমিদং দেবি পরং মোক্ষৈকসাধনম্।
জানন্নিহৈব মুক্তঃ স্যাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥ ১৩৫
ন কর্ম্মণা বিমুক্তঃ স্যান্ন সন্তত্যা ধনেন বা।
আত্মনাত্মানমাজ্ঞায় মুক্তো ভবতি মানবঃ॥ ১৩৬
প্রিয়ো হ্যাত্মৈব সর্ব্বেষাং নাত্মনোঽস্ত্যপরং প্রিয়ম্।
লোকেঽস্মিন্নাত্মসম্বন্ধাদ্ ভবন্ত্যন্যে প্রিয়াঃ শিবে॥ ১৩৭
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া।
বিচার্য্যমানে ত্রিতয়ে আত্মৈবৈকোঽবশিষ্যতে॥ ১৩৮
জ্ঞানমাত্মৈব চিদ্রূপো জ্ঞেয়মাত্মৈব চিন্ময়ঃ।
বিজ্ঞাতা স্বয়মেবাত্মা যো জানাতি স আত্মবিৎ॥ ১৩৯
এতত্তে কথিতং জ্ঞানং সাক্ষান্নির্ব্বাণকারণম্।
চতুর্ব্বিধাবধূতানাং এতদেব পরং ধনম্॥" ১৪০

মহানির্ব্বাণতন্ত্রের চতুর্দ্দশোল্লাসে সদাশিব শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার বিষয় সমুদয় বর্ণনা করিলে ভগবতী জিজ্ঞাসা করিলেন "বিভো! যদি অকস্মাৎ কোন দিবস দেবতার পূজা না হয় তাহা হইলে ভক্তেরা সে স্থলে কি

করিবে তাহা আমার নিকট যথাযথ বলুন। কোন্ দোষ হইলে দেবমূর্ত্তি অপূজ্য ও কোন্ দোষ উপস্থিত হইলেই ত্যাজ্য এবং তাহার সংশোধনের উপায় কি? তৎ সমুদায় "আমাকে বলুন।"

শ্রীসদাশিব কহিলেন "দেবি! যদি এক দিবস পূজাবাধ হয় তাহা হইলে সেই দেবমূর্ত্তি দ্বিগুণ পূজা করিবে। দুই দিন বন্ধ হইলে তাহার দ্বিগুণ, তিনদিন হইলে তাহার দ্বিগুণ পূজা করিতে হইবে। আর যদি চারি দিন হইতে ছয়মাস পূজা বন্ধ হয়, তাহা হইলে জ্ঞানী ব্যক্তি অষ্ট কলস জল দ্বারা দেবমূর্ত্তিকে স্নান করাইয়া পূজা করিবেন। যদি ছয় মাস অপেক্ষা অধিক কাল পূজাবাধ হয় তাহা হইলে সাধকশ্রেষ্ঠ পূর্ব্ব কথিত সংস্কারবিধানানুসারে দেবমূর্ত্তি পুনঃ সুসংস্কৃত করিয়া পূজা করিবেন। যে দেবমূর্ত্তি ভগ্ন হইয়াছে, স্ফুটিত বা সচ্ছিদ্র হইয়াছে বা কুষ্ঠরোগী কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইয়াছে অথবা দূষিত স্থানে পতিত হইয়াছে জ্ঞানী ব্যক্তি তাহার পূজা করিবেন না। যে মূর্ত্তির অঙ্গে ছিদ্র হইয়াছে, অঙ্গহীন হইয়াছে বা ভগ্ন হইয়াছে তাহা জলে বিসর্জ্জন করিবে। পরন্তু যে দেবমূর্ত্তি স্পর্শাদি দোষে দূষিত, তাহা পুনঃ সংস্কার করিয়া অর্চ্চনা করিতে পারিবে। মহাপীঠ ও অনাদি লিঙ্গে অঙ্গস্পর্শাদি কোন দোষ ঘটিতে পারে না সুতরাং সুখলাভের নিমিত্ত সর্ব্বদাই সেখানে স্ব স্ব ইষ্টদেবতার পূজা করিবে। মহামায়ে! কর্ম্মকাণ্ডনিরত মনুষ্যদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে আমি তৎসমুদয়ই বিশেষরূপে কহিলাম। মানবগণ কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণকাল মাত্রও থাকিতে পারে না। তাহারা কর্ম্ম করিতে অনিচ্ছুক হইয়াও বিবশ হইয়া কর্ম্মরূপ প্রবল বায়ু কর্ত্তৃক পরিচালিত ও আকৃষ্ট হয়। মনুষ্যেরা কর্ম্ম দ্বারাই সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে, কর্ম্মবশেই তাহারা জন্মগ্রহণ করে, কর্ম্মদ্বারাই শরীর ধারণ করিয়া থাকে এবং কর্ম্মবশেই মৃত্যুমুখে

পতিত হয়। এইজন্য অল্পজ্ঞ ব্যক্তিগণের সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি এবং দুষ্কর্ম্মের নিবৃত্তির জন্য বহুবিধ সাধন ও বহুবিধ কর্ম্ম কহিলাম।" ১০৬

এই পর্য্যন্ত কর্ম্মের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া একদল জ্ঞানী স্থির করিলেন কর্ম্মকাণ্ড কেবল অজ্ঞানীর জন্য ; যেহেতু ইংরাজী পড়িয়া তাঁহারা শিক্ষিত হইয়াছেন সুতরাং তাঁহারা জ্ঞানী নিশ্চিতই, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া প্রথমে তাঁহারা পূজা ধ্যানকে বিদায় দিলেন, অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডের পরে যে জ্ঞানকাণ্ড তাহাতে প্রবেশ করিয়া জ্ঞানামৃত পানে তৃপ্ত হইতে লাগিলেন এবং অন্যান্য অনেককেই তাঁহাদের সহযাত্রী করিতে প্রস্তুত হইলেন, কারণ তাঁহারা হিন্দুদের মত কুসংস্কারাপন্ন নহেন। হিন্দুরা যেমন সাধারণের নিকট সমুদয় লুক্কায়িত রাখেন, তাঁহারা তেমনিই বিশ্বপ্রেমিক হইয়া সর্ব্বত্রই সর্ব্বলোককে সমভাবে অতি উদারতার সহিত বিলাইয়া থাকেন। কিন্তু এই কর্ম্মত্যাগের ও জ্ঞানের রহস্যবোধ শাস্ত্রের দোহাই না দিয়া এমনই করিলে বেশ ভাল হইত। কারণ তাঁহারা জ্ঞানী তজ্জন্য কর্ম্ম করেন না ; কিন্তু আমরা দেখিতে পাই তাঁহারা সকলেই কর্ম্মচারী এবং কর্ম্মকারী। তবে তাঁহাদের হিসাবে স্ত্রীপুত্রের উপাসনার নিমিত্ত যাহা করা যায় তাহা ঈশ্বর আদিষ্ট এবং দেবতা উপাসনা মূর্খ লোকের কল্পিত, তাই তাঁহারা মূর্খদিগকে পরিহার করিয়া জ্ঞানী হইয়াছেন। যাহা হউক কর্ম্মতত্ত্ব আর একটু শুনা যাউক।

"কর্ম্ম দুই প্রকার শুভ ও অশুভ, অশুভ কর্ম্ম হইতে জীব তীব্র যাতনা প্রাপ্ত হয়। শুভ কর্ম্মফলেও আসক্ত হইলে কর্ম্মপাশ দ্বারা আবদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করিতে হয়। এই শুভ বা অশুভ কর্ম্মের যতকাল না ক্ষয় হয়, শতকল্প গত হইলেও জীবের মুক্তি হয় না।" এখানে তাঁহারা বুঝিলেন স্ত্রী পুত্রের জন্য যাহা করা যায় তাহা ঈশ্বর উপাসনা সুতরাং শুভ কর্ম্ম এবং অন্যান্য দেবতারাধনাদি অশুভ কর্ম্ম

সুতরাং তাহা ত্যাজ্য। বাস্তবিক ইহা তাঁহাদের বুদ্ধির বৈকল্য। যতদিন সৎ বা অসৎ কোন কর্ম্ম জীবের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইবে ততদিন সুখ বা দুঃখভোগ অবশ্যম্ভাবী, তজ্জন্য স্বর্গ বা নরক (এখানেই বা অন্য কোনখানে) অবশ্য ভোগ করিতে হইবে।

"শৃঙ্খল লৌহময় হউক বা স্বর্ণময় হউক উভয়ই বন্ধনের যাতনা দিতে সমান কার্য্যকারী। তদ্রূপ কর্ম্ম শুভ বা অশুভ যাহাই হউক বন্ধন যাতনা উভয়ত্রই সমান। সতত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে নানা কষ্টভোগ করিয়াও জীব যতকাল না জ্ঞান লাভ করে তাবৎ মুক্ত হইতে পারে না।" অর্থাৎ কর্ম্ম যদি অবোধের মত শুধু কর্ম্মের জন্য অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে জ্ঞানানুশীলন না থাকে, তবে উহা বন্ধন মোচনের কোনই সহায়তা করে না।

ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মের বিভূতি ভিন্ন জগতের এবং জাগতিক পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই এইরূপ তত্ত্ববিচার এবং নিষ্কাম কর্ম্ম এই উভয় দ্বারা পাপের ক্ষয় এবং অন্তঃকরণের নির্ম্মলতা সম্পাদিত হয় অর্থাৎ রজোগুণের শক্তি কাম এবং তমোগুণের শক্তি মোহ এই দুইটী যখন বিচার এবং উপাসনা দ্বারা শান্ত হইয়া যায় তখন সত্ত্বগুণরূপী জ্ঞানের উদয় হয়। ব্রহ্ম হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সমুদয় জগৎ মায়াদ্বারা কল্পিত, একমাত্র পরব্রহ্মই সত্য এই তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে জীব নিরন্তর সুখভোগ করে।" ১১৩

"যিনি নামরূপ ত্যাগ করিয়া নিষ্কল ব্রহ্মের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন তিনিই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হন।" ১১৪

দ্বৈত জগতের যাহা কিছু দেখিতে পাই, যাহা কিছু কর্ণপথে শুনিতে পাই, সকলই বাজীকরের বাজীর ন্যায় ক্ষণস্থায়ী মিথ্যা বস্তু। একমাত্র সকল খেলার মূলে যে বাজীকর আছে সেইই সত্য। ঘুম ভাঙ্গিলেই ঘুমঘোরে দৃষ্ট স্বপ্ন আর কিছু করে না; স্বপ্নের ব্যাঘ্র মানুষকে খায় না; স্বপ্নের রাজত্ব আর ভোগে আসে না; তদ্রূপ ভগবদ্ কৃপায় বা অন্য কোন

উপায়ে এই মোহঘোর, এই আমি দেহ—সুতরাং আমার স্ত্রী পুত্র ঘর বাড়ী ইত্যাদি মমতা যদি কাটিয়া যায় এবং সর্ব্বপদার্থের সত্তা যাহাতে অবস্থিত সেই একমাত্র নিত্য সত্য পদার্থ জানিতে পারা যায়, তবেই পূর্ণ সুখে সুখী হইবার সম্ভাবনা ; নতুবা এই সুখ দুঃখের হাত এড়াইবার আর উপায় নাই। যখন কোন পদার্থের স্থিরতা নাই, সকলই চঞ্চল, কি যেন কোন দিকে আকৃষ্ট হইয়া দ্রুত ছুটিয়া যাইতেছে, তখন যে নামরূপই কল্পনা করি না কেন তাহাই নষ্ট হইবে ; সুতরাং এই মিথ্যা-বস্তুকে ত্যাগ করিয়া যাহা সত্য, চিরস্থায়ী তাহার সন্ধান করিতে হইবে। মাটি হইতে ঘট প্রস্তুত হইল, স্বর্ণ হইতে নানাপ্রকার অলঙ্কার তৈয়ারী হইল, আবার ঐ ঘট চূর্ণ হইল, অলঙ্কারের আকার নষ্ট হইল ; রহিল কি ? মাটী ও স্বর্ণ—এই দুইটী হইল নিত্য বস্তু। ঘট আগে মাটী ছিল পরেও মাটী হইল, মধ্যে কেবল একটা নামরূপ লইয়া বিকট হাসি-কান্না চলিতেছিল। যদি ঘটকে বুঝিতে চাই জগতের বাহিরে যাইতে হইবে না। মৃত্তিকা এবং ঘটের পার্থক্য নামরূপের দ্বারা বুঝিলেই চলিবে। দেখা যাইবে ঘটটী চিরকাল থাকে না সুতরাং তাহা মাটীর তুলনায় মিথ্যা। তদ্রূপ ব্রহ্ম বা নিত্য সত্যবস্তুর সহিত তুলনায় সমুদয় মিথ্যা। কিন্তু যতক্ষণ আমি আছি, আমার আছে ততক্ষণ কি তাহা মিথ্যা ? স্বরূপতঃ তাহা মিথ্যা হইতে পারে। আমার তুলনায় তাহাত মিথ্যা নহে। স্বপ্নে দেখিলাম আমাকে ভূতে ধরিয়া লইতেছে, আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছি। স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ জাগরিত হইয়াই মিথ্যা বলিয়া জানিলাম—কিন্তু স্বপ্নাবস্থাতে স্বপ্নটীতো মিথ্যা নহে। সুতরাং জগৎ যে মায়া দেখাইতেছে তাহাও আমার তুলনায় মিথ্যা হইল না ; তাই যতদিন আমি আমার আছে, ততদিন তিনিও আছেন, মহামায়াও আছেন। যতদিন আমার স্ত্রীপুত্রের দেহ আমার নিকট সত্য, ততদিন

মায়াকল্পিত দেবতাও সত্য ; তাই এই সমস্ত মায়ার মায়াবীকে না পাওয়া পর্য্যন্ত, চিত্ত চিরসত্য ব্রহ্মতত্ত্বে না পৌছান পর্য্যন্ত, মহামায়ার রাজত্বে বাস করিয়া বিশ্বরূপ, দেবরূপ, সগুণবিরাট ভুলিলেত অজ্ঞান কাটিবে না ; কারণ তখনও যে চোখের আঁধার নাশ হয় নাই ; আলোকের আঁধারে দিশেহারা হইয়া যাই নাই। যতদিন 'আমি' আছি ততদিন 'তুমি' থাকিবেই, 'সেও' থাকিবে ; সুতরাং 'আমি' থাকিতে বিকট ব্রহ্মজ্ঞান আসা ভিন্ন প্রকৃত বস্তুর আলো পাওয়ার সম্ভাবনা নাই।

"জপ হোম এবং শত উপবাস দ্বারাও মুক্তি হইবে না, 'ব্রহ্মই আমি' হা জ্ঞাত হইয়া জীব মুক্ত হইবে।" ১১৫

জপ হোম বা উপবাসে মুক্তি হয় না, এই তাৎপর্য্য বুঝিয়াই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য তাহা নহে, নতুবা জপ হোমের ব্যবস্থা কিছুই করা হইত না। বাস্তবিক পক্ষে ইহার পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রাখিয়া অর্থ করাই বুদ্ধিমানের কাজ হইবে, সুতরাং এখানে সদাশিব বলিতেছেন যে "কর্ম্ম সমুদয় আত্মজ্ঞানের সাধনপরম্পরা, যাহার এই জ্ঞান নাই, তাহার শত বৎসরেও মুক্তির সম্ভাবনা নাই, নতুবা ব্রহ্মমন্ত্র জপের ব্যবস্থাই বা দিবেন কেন? ইহা দ্বারা এই বুঝিতে হইবে সাধারণ লোকে কর্ম্মের অধিকারী নহে। যাহার কর্ম্ম, কর্ত্তা ও কর্ম্মফলের জ্ঞান আছে তিনিই শাস্ত্রোক্ত সাধনের উপযোগী। "আত্মা সাক্ষী অর্থাৎ নির্লিপ্ত শুভাশুভ দ্রষ্টা, তিনি বিষ্ণু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক, অনন্তস্বরূপ ; তিনি সত্য, অদ্বিতীয় এবং পরাৎপর, তিনি দেহস্থ হইয়াও দৈহিক কার্য্যে লিপ্ত নহেন," এইরূপ জ্ঞান জন্মিলেই জীব মুক্ত হইতে পারে। বালক যেমন পুতুলের সহিত পুত্র কন্যা বৈবাহিক ইত্যাদি সম্বন্ধ স্থাপন করে এবং খেলার অবসানে সমুদয় নামরূপাদি ত্যাগ করে, তদ্রূপ এই সংসারে স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া নামরূপের

খেলা হইয়া থাকে, ইহা জ্ঞাত হইয়া তিনি সত্যব্রহ্মে অবস্থিত এবং মুক্ত হইয়া যান। ১১৭॥ "মনঃকল্পিত দেবমূর্ত্তি যদি মনুষ্যদিগকে মোক্ষদান করিতে পারে তাহা হইলে স্বপ্নলব্ধ রাজত্বেও রাজা হইতে পারে। যাহারা মৃত্তিকা প্রস্তর ধাতু বা কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত মূর্ত্তিকে ঈশ্বর বোধ করিয়া তপস্যাদি করে তাহারা কেবল বৃথা কষ্ট পায়। ফলতঃ জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি হয় না। যাহারা কেবল বায়ুমাত্র, পর্ণমাত্র বা তণ্ডুলকণামাত্র কিংবা জলমাত্র পানকরিয়া ব্রতধারণ করে তাহাদের যদি মোক্ষ হয়—তাহা হইলে সর্প পক্ষী জলজন্তু ইত্যাদি সকলেই মুক্ত হইতে পারে।" ১২১

প্রথমেই দেখান হইয়াছে যে মানুষের কল্পিত মূর্ত্তিউপাসনায় কোনই লাভ নাই সুতরাং তাহার উপাসনা করা বৃথা এবং শাস্ত্রকার সে উপাসনার পক্ষপাতী নহেন। মৃত্তিকা কাষ্ঠ বা প্রস্তরে ঈশ্বর কল্পনা করা হিন্দুদিগের উপাসনা নহে। যাঁহারা এরূপ মনে করেন তাঁহারা বিশেষ কৃপার পাত্র। পূজাপ্রকরণে যে প্রণালী কথিত হইয়াছে তদনুযায়ী প্রতিমাতে ভাবনা বা যোগশক্তি দ্বারা আত্মতেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাহা এই সব সাধারণ বুদ্ধিতে প্রবিষ্ট হইবার নহে। মনও তাঁহারই সৃষ্ট, সুতরাং মনে মনে প্রার্থনা করিলেও তাঁহারই হইল। যদি বলেন সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম তাঁহাকে এইরূপে উপাসনা করা বাতুলতা ভিন্ন কিছুই নহে। তাঁহারই সৃষ্টপদার্থ ফুল বেলপাতা দ্বারা পূজা করা মূর্খতা মাত্র। আমরা বলি সর্ব্বব্যাপী নিরাকার ব্রহ্ম মৃত ব্যক্তিতেও আছেন সুতরাং তাহাদ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না কেন? গরুর দুধে ঘৃত আছে সুতরাং গরুর শরীরে ক্ষত হইলে অমনিই সারে না কেন? তাহার জন্য দুগ্ধদোহন করিয়া মন্থন দ্বারা ঘৃত নিষ্কাশন করিলে এবং তাহা ক্ষতস্থানে ব্যবহার করিলে তবেই রোগ নিবৃত্তি সম্ভব হয়। তদ্রূপ সর্ব্বব্যাপীপদার্থ দ্বারা আমাদের কিছু লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই—যতদিন তাহাকে নিজের ব্যবহারের

উপযোগী করিতে না পারি—এই জ্ঞান না থাকিয়া উপাসনা করিলে তাহা নিরর্থক হয়। যথেষ্ট আহার বা নিরাহার যাহাই করুক না, আত্মজ্ঞান উদ্দেশ্য না হইলে সমুদয় বৃথা ইহাই তাৎপর্য্য। নতুবা যাহার যে প্রকার খাদ্য সে তাহা খাইবেই সুতরাং সে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল না। "ব্রহ্মই সত্য আর সমুদয়ই মায়াকল্পিত ও মিথ্যা। আমিই সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম, ঈদৃশ ভাব উত্তম, ধ্যান ভাব মধ্যম, স্তব এবং জপভাব অধম এবং বাহ্যপূজা অধম হইতেও অধম। জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যের নামই যোগ। সেবক ও ঈশ্বর ভাব প্রতিপাদনের নামই পূজা; ফলতঃ যাঁহার জ্ঞান হইয়াছে, যিনি সমুদয়ই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই, এইরূপ যথার্থ ভাবিতে শিখিয়াছেন তাঁহার নিমিত্ত যোগ বা পূজা কিছুরই আবশ্যক হয় না। যাঁহার হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ পরমজ্ঞান বিরাজিত হইতেছে তাঁহার পক্ষে জপ যজ্ঞ তপস্যা নিয়ম ব্রত কিছুই আবশ্যক নাই। যিনি সর্ব্বত্র একরূপ সত্যস্বরূপ বিজ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম অবলোকন করিতেছেন তিনি স্বভাবতঃই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছেন; তাঁহার পক্ষে পূজা বা ধ্যান ধারণা কিছুই সম্ভব হয় না।" ১২৫ ব্রহ্মই সত্য, সকলই মিথ্যা এই ভাব যাঁহার আছে তাঁহার নিকট সাংসারিক স্ত্রীপুত্রপরিবার সমুদয়ই মিথ্যা হওয়া উচিত, শুধু পূজা জপকে ত্যাগ করিবার প্রয়োজন কি? যাঁহাদের 'আমি সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম' এই জ্ঞান হইয়াছে তাঁহাদের ভাব উত্তম। কিন্তু এরূপ জ্ঞানী কি কেহ আছেন? তাঁহার 'আমি' দেহকে ছাড়েনা কেন? এবং দেহের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট আমার বলিতে যাহা কিছু তাহা যায় না কেন? তাহার প্রতি এত মমতা কেন? এবং তজ্জন্য এত মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি? ধ্যানভাব মধ্যম; ধ্যানের সহিত কাহারও কি কিছু সম্বন্ধ হইয়াছে? ধ্যেয়বস্তুতে তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন চিন্তাপ্রবাহ উত্থানের নাম ধ্যান।

তাঁহাদের ধ্যেয়ই নাই সুতরাং চিন্তা করেন কি? নিরাকারের ধ্যান বলিতে কি বুঝিব? নিরাকার কি কেহ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? অথবা নিরাকার চিন্তা করিতে পারেন? আকার নাই এমন কোন পদার্থের কল্পনা কেহ করিতে পারেন কি? একমাত্র আকাশের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। কিন্তু আমরা যাহা দেখি তাহা ত পরিচ্ছিন্ন। চক্রবাল দ্বারা তাহারও আকার গঠিত হয় এবং তাহা বায়ু তেজ ও মেঘের গুণে নানাপ্রকার আকার ধারণ করে সুতরাং নিরাকার কল্পনায় আসিল কই? সুতরাং তাহার ধ্যান ত হইবার নহে।

বাহ্যপূজা অধম হইতেও অধম, তাহা স্বীকার্য্য। তাহাতে আপনাদের বিশ্বাসও নাই এবং করিবার সামর্থ্যও নাই সুতরাং বচন ভিন্ন আর ত উপায় দেখি না। তাই আপনারা বাক্যবিশারদ।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যের নাম যোগ—তাহাও আপনাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কারণ, না দেখিয়া দুই বস্তু যোগ করা যায় কিরূপে?

সেবক ও ঈশ্বরভাবও আপনাদের পক্ষে সম্ভব নহে কারণ ঐশ্বর্য্য না থাকিলে ঈশ্বরই হয় না এবং অন্তঃকরণ ও শরীর না থাকিলে ঐশ্বর্য্য সিদ্ধ হয় না; সুতরাং সে দিকেও আঁধার।

যিনি সর্ব্বত্র এক সত্যজ্ঞান আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মদর্শন করেন, তাঁহার পক্ষে পূজা বা ধ্যান কিছুই নাই। ব্রহ্মভাব যাহার পক্ষে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় স্বাভাবিক অর্থাৎ যিনি সর্ব্বদাই সত্যজ্ঞানআনন্দস্বরূপ হইয়াছেন তাঁহার পক্ষে আর কিছুই নাই—সমস্ত পূজা জপ শেষ হইয়া গিয়াছে। তাই আপনারা সকল দেবতার উপাসনা ত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম হইয়াছেন এবং নিরাকার ভজনা করিতেছেন ও সেই জন্য দাসত্ব, পুত্রোৎপাদন, গৃহকর্ম্ম নির্ব্বাহ ইত্যাদি ব্রহ্মস্বরূপেই হয় বুঝিতেছি। ধন্য কলি ও তাহার অনুচরগণের কীর্ত্তিকলাপ! নতুবা এত বিপরীত বুদ্ধি হইবে কেন? জগৎ

যাঁহার বিভূতি, এত অঘটন যাহা হইতে হইয়াছে, তাঁহাকে নিজের গণ্ডিতে ফেলিয়া ওজন করা কতদূর ধৃষ্টতা। বাস্তবিকই তাঁহারা ব্রহ্মভূত বা ব্রহ্মদৈত্য, নতুবা ভূতের ন্যায় বিসদৃশ বুদ্ধি আসিবে কোথা হইতে এবং সকলের স্কন্ধে আরোহণ করিবেন কিরূপে ?

"'আমি জীব' এই জ্ঞান যাঁহার নাই সুতরাং সমুদয়ই ব্রহ্ম এইরূপ জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে, তাঁহার পাপ পুণ্য স্বর্গ নরক বা পুনর্জ্জন্ম কিছুই নাই। তাঁহার পক্ষে ধ্যান ধ্যেয় বা ধ্যাতা কিছুই নাই। এই চৈতন্যরূপ আত্মা সদামুক্ত। তিনি কিছুতেই লিপ্ত নহেন। তাঁহার বন্ধনই বা কোথায় ? সুতরাং অল্পজ্ঞ ভিন্ন কে তাঁহার মুক্তি কামনা করে ?" ১২৭

"বিশ্ব তাঁহার নিজ মায়ারচিত এবং দেবতারাও তর্ক দ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারেন না। তিনি জগতে প্রবিষ্ট না হইয়াও প্রবিষ্টের মত দেখাইতেছেন। আকাশ যেমন সর্ব্ব বস্তুর অন্তরে এবং বাহিরে বিরাজমান তদ্রূপ সদ্রূপ ও সাক্ষী আত্মা সর্ব্বভূতে বিরাজমান রহিয়াছেন। এই আত্মার বাল্য, যৌবন বা বার্দ্ধক্য নাই, তিনি সদা একরূপ চৈতন্যস্বরূপ, এবং বিকারবর্জ্জিত। জন্ম, যৌবন ও বার্দ্ধক্য প্রভৃতি যাহা কিছু দেখা যায় তৎসমুদয় দেহের। মায়াবৃতবুদ্ধি নরগণ তাহা বুঝিতে পারে না।" ১৩১

"বহু সরাবস্থিত জলের মধ্যে যেমন বহুসূর্য্য দৃষ্ট হয়, সেইরূপ মায়া প্রভাবেই বহু শরীরে বহুবিধ আত্মা লক্ষিত হইতেছে। যেমন জল চঞ্চল হইলে তাহাতে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রও চঞ্চল বলিয়া মনে হয়, অজ্ঞান ব্যক্তিরাও তদ্রূপ বুদ্ধির চাঞ্চল্যবশতঃ আত্মাকে চঞ্চল বলিয়া মনে করে। যেমন ঘট ভগ্ন হইলেও ঘটস্থ আকাশ পূর্ব্বের ন্যায় অবিকৃত থাকে, দেহ নষ্ট হইলেও আত্মা তদ্রূপ সমরূপেই অবস্থিত থাকে।" ১৩৪

"দেবি! মুক্তির পরম সাধন এই আত্মজ্ঞান অবগত হইলে জীব সত্য-

সত্যই এই শরীরেই মুক্ত হইয়া যায় এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কর্ম্মানুষ্ঠান, ধনদান বা সন্ততি দ্বারা মুক্তি হয় না। আত্মার দ্বারা আত্মতত্ত্ব অবগত হইলেই মানব মুক্ত হয়। দেবি! সকল জীবের পক্ষে আত্মাই পরম প্রেমাস্পদ, আত্মা হইতে প্রিয়তর অপর কিছুই নাই। ইহলোকে যে অন্যকে প্রিয় বলিয়া মনে করে তাহা আত্মসম্বন্ধ হেতু। জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা এই ত্রিতয় কেবল মায়া দ্বারাই প্রতিভাত হইতেছে, পরন্তু এই ত্রিতয়ের তত্ত্ব বিচার করিলে একমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন, আর কিছুই থাকে না। চৈতন্যময় আত্মাই জ্ঞান, আত্মাই জ্ঞেয় এবং আত্মাই জ্ঞাতা, যিনি ইহা জানিয়াছেন তিনিই তত্ত্ববিৎ। সাক্ষাৎ নির্ব্বাণমুক্তির কারণ এই জ্ঞান তোমাকে বলিলাম, চতুর্ব্বিধ অবধূতের ইহাই পরম সাধন।" ১৪০

এখন যাঁহারা বলেন ব্রাহ্মণেরা অবিচার করিয়াছেন তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি—ইহা কি অবিচারের লক্ষণ? কর্ম্ম, জ্ঞান বা ভক্তি সবই ত এই তন্ত্রশাস্ত্রে রহিয়াছে এবং পুরাণেও বর্ত্তমান আছে, তবে আর অসম্বদ্ধপ্রলাপ বকিয়া লাভ কি? শুধু পাশ্চাত্যগণের চর্ব্বিতশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ইহকাল ও পরকালের জন্য অসন্তোষের বীজ বপন করা উচিত নহে, বরং যাহাতে স্বকর্ম্মে সংযত হইয়া স্বারাজ্যসিদ্ধিরূপ আত্ম-জ্ঞানলাভ হয় তাহাই সকলের কর্ত্তব্য।

অপরদিকে যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানের ভানে নিজেদের ইহকাল ও পরকাল সব নষ্ট করিয়াছেন এবং অন্যকেও সর্ব্বনাশের পথে টানিয়া লইতেছেন তাঁহাদিগকে কালসর্প বলিয়া দূরে পরিহার করিতে হইবে। সমস্ত মহা-নির্ব্বাণতন্ত্রের মধ্যে চারিটী শ্লোক লইয়া তাঁহারা নিরাকার ব্রহ্ম উপাসনা প্রচার করিলেন, তাহাও কদর্থ করিয়া। পূর্ব্বাপর সমুদয় সমন্বয় করিয়া শাস্ত্রার্থগ্রহণ করা উচিত। শাস্ত্র মানিতে হইলে সম্পূর্ণই গ্রহণীয়, নতুবা

প্রক্ষিপ্তবাদে যে ক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাঁহারা তাহা ভাবিতে পারেন কি ?

"বিহায় নামরূপাণি সত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে।
পরিনিষ্ঠিততত্ত্বো যঃ স মুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনাৎ॥
বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বং নামরূপাদিকল্পনং।
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ॥
মনসা কল্পিতা মূর্ত্তির্নৃণাং চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তদা॥
মৃচ্ছিলাধাতুদার্ব্বাদি মূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তস্তপসা জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যান্তি তে"॥

ইহা দ্বারা নিরাকারবাদের নাকি উৎকৃষ্ট প্রমাণ হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের বুদ্ধির দোষে আমরা এত সহজে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। শাস্ত্রানুযায়ী দ্বৈততত্ত্ব সম্পূর্ণ পরিত্যাগপূর্ব্বক অদ্বৈতসত্তায় সম্পূর্ণ মন লীন করিতে পারিলে ব্রহ্মজ্ঞানী বলা হয়।
কিন্তু এ ব্রহ্মজ্ঞানে আত্মীয় স্বজন এবং ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া শুধু দেবতা নামসমেত উড়াইতে পারিলেই অচিরাৎ সিদ্ধিলাভ হয়। একি সিদ্ধি না স্বপ্ন, তাহা ধারণাতেও আসে না। স্বভাবতঃ ব্রহ্মভূত বা ব্রহ্মদৈত্য হইতে পারিলে ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়া যায়, সুতরাং পূজা ধ্যানাদির আর প্রয়োজন থাকে না। মৃত ব্যক্তি ভূত হয় জানিতাম, এ জীবিত ভূতের জ্বালায় দেশ যে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।

"ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।
সত্যমেকং পরংব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখীভবেৎ॥"

বিরাট ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সমুদয় যদি মায়া দ্বারা কল্পিত হয় তবে আমরাই বা বাদ যাই কোথা হইতে, তুমি আমি সকলেই সেই জগতের অন্তর্গত। সকলের নামরূপ বর্ত্তমান রহিল, শুধু দেবতাগুলি বাদ গেল কেন? ব্রহ্মন্ শব্দের অর্থ কি—চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বা ব্রহ্ম? 'ব্রহ্মা আদি' না হইয়া যদি 'ব্রহ্ম আদি' হন, তবেত মূলেই উৎপাটন হইল। সুতরাং ব্রহ্মা-আদি স্বীকার করিলেই আবার দেবতা স্বীকার করিতে হইল, এসব কি তাঁহারা চিন্তা করিতে অবসর পান? ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্ত মায়াকল্পিত ইহার দ্বারা যদি কিছুই না থাকে, তাহা হইলে দৃশ্যস্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ উড়িয়া যায় না কেন? একগাছি তৃণকেও উড়াইবার অথবা চালাইবার ক্ষমতা কাহারও দেখি না। তবে দেবতার নামরূপ লইয়া এত দুঃসহ যাতনা ভোগ কেন? ইহা কি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কোন শত্রুতার ফল অথবা শিক্ষা সংসর্গের অভূতপূর্ব্ব পরিণাম?

চতুর্ম্মুখ সাকারব্রহ্মাকে উড়াইতে যাইয়া যদি 'ব্রহ্ম আদি' লওয়া হয় এবং (অনেকেই তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন) তাহা হইলে যে আরও বিপদ, কারণ যে বৃক্ষের শাখার ছায়ায় বসিয়া, যাহার প্রেমফল ভক্ষণ করিয়া, যাহার চরণতলে নত হইয়া, আনন্দ সাগরে ভাসিবেন এইরূপ বাসনা মনে ছিল, তাহা মূলশুদ্ধ উৎপাটিত হইয়া গেল, সুতরাং প্রার্থনার আর আবশ্যকতাই রহিল না।

যদি শাস্ত্র লইয়া বিচার করিতে হয় তবে তাহার আগা গোড়াই মানা দরকার হইয়া পড়ে। নতুবা মূর্ত্তিপূজা বাদ দিয়া শুধু ধ্যান ধারণা লইতে গেলে তাহাতেও মুক্তি হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। কারণ তাহাতেও মনোময়ী মূর্ত্তি কল্পিত হইবে। মনঃকল্পিতমূর্ত্তির'ত আগেই সপিণ্ডনব্যবস্থা করা হইয়াছে এখন এ আবার কোন্ মন যদ্দ্বারা মনে মনে সর্ব্বকার্য্যসিদ্ধির আশা করা যাইতেছে? যদি মনের দ্বারাও সিদ্ধি না হয়

তাহা হইলে সবই পণ্ডশ্রম হইয়া পড়িবে। তাই বলিতেছি যদি মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের চারিটী বচন সিদ্ধ হয় তবে বাকি গুলির অপরাধ কি? তাহারা কি সতীনের ছেলে? হিমালয় হইতে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত গঙ্গা বিস্তৃত রহিয়াছে তাহার মধ্য হইতে আমি যে গণ্ডূষ চতুষ্টয় জল উঠাইয়া লইয়াছি তাহাই গঙ্গাজল আর বাকী নর্দ্দমার অপরিষ্কৃত দুর্গন্ধময় জল ইহা বলা কতদূর জ্ঞানবুদ্ধির পরিচায়ক তাহা কি তলাইয়া দেখিয়াছেন? সর্পের মুখে দুগ্ধও গরল হইয়া যায়—আকাশ হইতে পতিত সুবিমল বারিও নিম্ববৃক্ষে তিক্ত হইয়া যায়—তাই নাস্তিকগুলির হাতে পড়িয়া সমস্ত শাস্ত্র বিষ হইয়া গিয়াছে এবং সেই গরল পানে উন্মত্ত ভারতবাসী ধ্বংসের মুখে অতি দ্রুত ধাবিত হইতেছে।

"মালতীমল্লিকামোদং ঘ্রাণং বেত্তি ন লোচনং" মালতী এবং মল্লিকার সুগন্ধ নাসিকাই গ্রহণ করিতে পারে, চক্ষুর সে ক্ষমতা নাই। সেইরূপ সাকার উপাসনা ও তাহার তত্ত্ব তাঁহাদের বুঝিবার ক্ষমতা নাই। আমাদের মনে হয় তাঁহারা মানবশরীরধারী হইলেও বুদ্ধিশক্তিহীন উদ্ভিদ্ জাতির ন্যায়।

তীর্থগুলি তীর্থ নহে এবং দেবতাগুলি দেবতা নহে ইহা প্রমাণিত করিবার জন্য তাঁহারা যে দুইটী শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন তাহার অর্থও যে তাঁহারা কিছুই বোঝেন নাই তাহাও উল্লেখ করিয়া সাধারণকে দেখান যাইতেছে যে তাঁহারা উদ্ভিৎ শ্রেণীর অন্তর্গত কিনা।

"ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥" ভাগবত

"জলময় তীর্থ সমূহ তেমন তীর্থ নহে এবং মৃৎশিলাময় দেবতাগণ তেমন দেবতা নহেন, যেমন সাধুগণ দেবতা ও তীর্থ; কারণ বহুকাল সেব

ও আরাধনা করিলে জলময় তীর্থ এবং মৃৎশিলাময় দেবতাগণ পবিত্র করিতে পারেন ; কিন্তু সাধুগণের প্রভাব এতই পবিত্র যে তাঁহারা দর্শন-মাত্রেই সকলকে পবিত্র করেন।"

"যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥

সর্ব্বভূতের আত্মা ঈশ্বর, এইরূপ না জানিয়া যে মূঢ়মতি মূর্ত্তির উপাসনা করে, সে কেবল ভস্মেই আহুতি প্রদান করে অর্থাৎ তাহার পূজা নিরর্থক হয়। প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তাঁহারা বুঝাইয়াছেন জলময় তীর্থ, তীর্থই নহে এবং মৃন্ময় দেবতা দেবতাই নহেন ; কিন্তু যদি তাহা স্বীকার করা যায় তাহা হইলে দীর্ঘকাল সেবা দ্বারা তাঁহারা পবিত্রতা বিধান করেন, ইহা বলায় কোনই সার্থকতা রহিল না। যাহার মূলে কোন সত্তাই নাই সে আবার পবিত্র করিবে কাহাকে? এখানে তীর্থ এবং মূর্ত্তি অপেক্ষা ভগবদ্ভক্তের প্রভাব যে অধিক তাহাই দেখান হইয়াছে। নতুবা উত্তর-কালে সেবা আরাধনার ফলে তাহাতে পবিত্রতা সাধিত হয় ইহা বলা নিরর্থক হইয়া পড়িত। দ্বিতীয় শ্লোকে আরও বিপরীত জ্ঞান প্রকাশ পাইয়াছে। দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক কাহাকে বলে তাহারই যে জ্ঞান নাই। নতুবা যাঁহারা পূজা জপ মানেন না তাঁহারা ভস্মে আহুতি দিবার কথা বলিলেন কি প্রকারে?

আহুতি প্রদান দ্বারা সাকার উপাসনাই সমর্থিত হয় এবং হোমাদি স্বীকার করা হইল কারণ অগ্নিতে আহুতি দেওয়া আছে। সুতরাং এ শ্লোকের তাৎপর্য্যে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, যিনি ঈশ্বর সর্ব্বভূতে চৈতন্যরূপে অবস্থিত আছেন এইরূপ জ্ঞাত আছেন তিনিই, প্রতিমায় চৈতন্য সংক্রামিত হইতে পারে বুঝিতে পারেন, সুতরাং এই জ্ঞান যাঁহার আছে

তিনিই মূর্ত্তিপূজার অধিকারী। যাঁহার এই জ্ঞান নাই,অথচ যিনি মূর্ত্তিপূজায় রত হন তাঁহার ভস্মে আহুতি দেওয়ার ন্যায় সমুদয় নিরর্থক হইয়া থাকে। ভ্রান্ত পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত আমরা দিগ্‌দর্শন যন্ত্র স্থাপিত করিলাম। আশাকরি এইদিকে দৃষ্টিকরতঃ পথিক আর ইতস্ততঃ আপনার চরণ যুগল চালিত করিয়া মোহগর্ত্তে নিপতিত হইবেন না। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে যে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহার সর্ব্বশেষে কথিত হইয়াছে "এই যে জ্ঞান তোমাকে বলিলাম ইহা চতুর্ব্বিধ অবধূতগণের সাধন।" অবধূত শব্দের দ্বারা কি বোঝা যায় তাহাই এবার বুঝিতে হইবে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র অষ্টম উল্লাস—

"ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমো নাস্তি বানপ্রস্থোঽপি ন প্রিয়ে।
গার্হস্থ ভিক্ষুকশ্চৈব আশ্রমৌ দ্বৌ কলৌ যুগে॥ ৮

কলিযুগে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম এবং বানপ্রস্থাশ্রম নাই, গার্হস্থ এবং ভিক্ষুক এই দুই আশ্রম বর্ত্তমান।

অবধূতাশ্রমো দেবি কলৌ সন্ন্যাস উচ্যতে।
বিধিনা যেন কর্ত্তব্যস্তৎ সর্ব্বং শৃনু সাম্প্রতম্॥" ২২২
"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সামান্য এব চ।
কুলাবধূতসংস্কারে পঞ্চানামধিকারিতা॥" ২২৫

সদা শিব কহিলেন—"অবধূত আশ্রমকেই কলিযুগে সন্ন্যাস বলা হয়; তাহা কিরূপ বিধান অনুযায়ী করিতে হইবে তাহা বলিতেছি তাহা শ্রবণ কর॥" কুলাবধূতসংস্কারবিষয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও সামান্য জাতি সকলেরই অধিকার আছে॥"

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের এই শ্লোক কয়টী এস্থানে উল্লেখ করা গেল। যাঁহারা বলেন কলিযুগে সন্ন্যাস বা অন্য কোন আশ্রম নাই তাঁহারা নিজেদের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিবেন এবং অবস্থার উন্নতিতে যে এক আশ্রম হইতে অন্য আশ্রমে গমন করার উল্লেখ আছে তাহাও দেখিতে পাইবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

এইবার আমরা আশ্রমধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। বর্ণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় আমরা দেখিয়াছি যে বর্ণ ধর্ম্ম উচ্ছৃঙ্খলতার নিবারক সুতরাং প্রবৃত্তির রোধক এবং আশ্রমধর্ম্ম নিবৃত্তির পোষক।

যদ্দ্বারা নিবৃত্তির পুষ্টি সাধিত হয় অর্থাৎ ক্রমশঃ মানবের অন্তঃকরণ নিবৃত্তিপরায়ণ হয় সুতরাং প্রবৃত্তির উচ্ছেদ সাধিত হয় তাহাই নিবৃত্তি-পোষক বলা হইয়া থাকে; সংসারে গমনাগমন নিবারিত হয়, তজ্জন্য ইহার নাম নিবৃত্তিমার্গ কথিত হয়। যদি কলিযুগে সংসারে নিবৃত্তি-মার্গ অবলম্বন করা অনভিপ্রেত হইত অর্থাৎ কেহ ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির জন্য সচেষ্ট না হইতেন, তাহা হইলে বলা যাইত যে কলিযুগে আশ্রমধর্ম্ম অবলম্বন করা উচিত নহে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে আমরা তাহার বিপরীতই সর্ব্বদা দেখিতে পাইতেছি। যদিও কলিযুগে যুগধর্ম্ম প্রভাবে অধিকাংশ লোক পরকালে বিশ্বাসী নহে সুতরাং তাহারা পুনরায় গমনা-গমন বিশ্বাস করে না কিন্তু এ সময়ে কেহই যে পরকালবিশ্বাসী নহে বা সাংসারিক নানাপ্রকার দুঃখে তপ্ত নহে, ইহা মানিবার কোন হেতু নাই বরং পরকাল সম্বন্ধে নানা প্রকার মতভেদ হইয়াছে এবং পরকালে গতিলাভের জন্য নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইতেছে; এই সব পন্থায় যাঁহারা বিচরণশীল তাঁহারাই পরকালের নিমিত্ত বা নিবৃত্তিপোষণের জন্য আশ্রমান্তর গ্রহণের আবশ্যকতা মনে করেন না। কিন্তু তাঁহাদের জন্য তাদৃশ ব্যবস্থার সমর্থন করা যুক্তি সঙ্গত নহে। শাস্ত্রও তাহার

পোষকতা করে না। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রের অভিপ্রায় মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে কিছু উল্লেখ করা গিয়াছে। কারণ কালধর্ম্মে বৈদিক ক্রিয়া কলাপ বর্জ্জিত হইয়া যাইতেছে এবং বাংলা দেশের অধিকাংশ স্থলেই তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভুত্ব এখনও অধিক পরিমাণেই লক্ষিত হয়। হিন্দুর প্রধান মাননীয় গ্রন্থ বেদ ও উপনিষদ্; ঐ উপনিষদে চারি আশ্রম সম্বন্ধে স্পষ্টতঃই বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারিটী আশ্রম। উপনিষদে ও তৎমূলক স্মৃতি শাস্ত্রাদিতে তাহার বহুল ব্যবস্থা লিখিত আছে। ইতিহাস ও পুরাণাদিতেও আশ্রমধর্ম্ম সম্বন্ধে বহুপ্রকার আলোচনা দেখিতে পাই। এরূপ কোন প্রমাণ নাই যাহাতে কলিযুগে আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপাল্য নহে বা যথেচ্ছাচারই কলিযুগের একমাত্র ধর্ম্ম। অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে হইলে তাহার ভিত্তিভূমি অতি সুদৃঢ় করা প্রয়োজন নতুবা অট্টালিকার স্থিতিকাল দীর্ঘ হয় না। তদ্রূপ নিবৃত্তিভূমিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে তাহার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমকে দৃঢ় করিয়া লইতে হয় ইহাই সর্ব্ব শাস্ত্রের বিধান। তজ্জন্য সর্ব্বসাধারণের নিমিত্ত বাল্যকাল হইতে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের ব্যবস্থা ছিল। এই আশ্রমে বিদ্যা-শিক্ষা এবং শুক্রধারণের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার কঠোরতা অবলম্বন করা হইত। (তাহার নিয়মগুলি ও অনুষ্ঠানের উপায় স্থানান্তরে উল্লেখ করা যাইবে) তাহার পর স্ববর্ণানুমোদিত কুলজাত কন্যাকে যথাশাস্ত্র বিবাহ করিয়া পুত্রোৎপাদনাদি দ্বারা সংসার এবং পিতৃপিতামহের জলপিণ্ডের ব্যবস্থা করা হইত। পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রমের পর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই দ্বিজাতিগণের বানপ্রস্থাশ্রমরূপ কঠোর তপস্যা দ্বারা শরীর এবং ইন্দ্রিয়ের যথোচিত শোধনের ব্যবস্থা হইত এবং পরিশেষে সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করতঃ সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনরূপ নিবৃত্তি আশ্রম গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল। ব্রাহ্মণেতর অন্য কাহারও সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল না। তাঁহারা

বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বী হইতেন এবং পরিশেষে অগ্নিপ্রবেশ বা মহাপ্রস্থানের নিমিত্ত ক্রমাগত উত্তরদিকে চলিতে থাকিতেন। শূদ্রগণ ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমবাসী হইতেন না কিন্তু গৃহেই ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতেন এবং গৃহস্থ ধর্ম্ম আচরণ করিতেন এবং ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের শুশ্রূষা দ্বারা তদধিগত বিদ্যাদি লাভ করিতেন এবং পরিশেষে জ্ঞানাদি লাভ করিতেন। এতৎ-সম্বন্ধে উপনিষৎপ্রমাণ উল্লেখ করা যাইতেছে। "ব্রতীভূত্বা গৃহী ভবেৎ গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ। বনীভূত্বা প্রব্রজেৎ" অর্থাৎ ব্রতী (ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী) হইতে গৃহী হইবে, গৃহী হইতে বনী হইবে এবং বনী হইতে সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে।

যৎ কার্য্যং ব্রাহ্মণস্যেহ জন্ম প্রভৃতি তচ্ছৃণু।
কৃতোপনয়নস্তাত ভবেদ্ বেদপরায়ণঃ॥ ১৪
বেদানধীত্য নিয়তো দক্ষিণামপবর্জ্য চ।
অভ্যনুজ্ঞামথপ্রাপ্য সমাবর্ত্তেত বৈ দ্বিজঃ॥ ১৬
সমাবৃত্তশ্চ গার্হস্থ্যে স্বদারনিরতো ভবেৎ।
উৎপাদ্য পুত্রপৌত্রং তু বন্যাশ্রমপদে বসেৎ॥ ১৭
স বনেঽগ্নীন্ যথান্যায়মাত্মন্যারোপ্য ধর্ম্মবিৎ।
নির্দ্বন্দ্বো বীতরাগাত্মা ব্রহ্মাশ্রমপদে বসেৎ॥ ১৮

মহাভারত ৩২৭ অধ্যায়।

শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়ে শুক জনক সংবাদে মহারাজ জনক শুককে উপদেশ দিতেছেন যে আপনি ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব সুতরাং আপনার পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য তাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন।—"উপনয়ন-সংস্কারের পর ব্রাহ্মণ গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ হইয়া বেদাধ্যয়ন করিবেন,

বেদাধ্যয়নের পর গুরুকে দক্ষিণা প্রদান করিবেন এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া সমাবর্ত্তন করিবেন, অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবসান করিবেন। তদনন্তর বিবাহ করতঃ স্বদারনিরত হইবেন ; অগ্নি গ্রহণ পূর্ব্বক যথাবিধি হোম ও পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন ; পুত্র পৌত্রাদির জন্ম হইলে বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিবেন এবং অগ্নি অতিথি আদির পরিচর্য্যা-পরায়ণ হইবেন। পরে যথাশাস্ত্র অগ্নিকে আত্মাতে স্থাপনপূর্ব্বক সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করিবেন।"

শুক উবাচ—

উৎপন্নে জ্ঞানবিজ্ঞানে নির্দ্বন্দ্বে হৃদি শাশ্বতে।
কিমবশ্যং নিবস্তব্যমাশ্রমেষু ভবেত্ত্রিষু॥
এতদ্ভবন্তং পৃচ্ছামি তদ্ভবান্ বক্তুমর্হতি।
যথা বেদার্থতত্ত্বেন ব্রুহি মে ত্বং জনাধিপ॥

শুক বলিলেন, "যদি কাহারও প্রথম আশ্রমেই পরোক্ষজ্ঞান এবং অপরোক্ষ ব্রহ্মবিজ্ঞান জন্মে তাহা হইলেও কি তাহাকে অন্য তিন আশ্রম অবশ্যই অবলম্বন করিতে হইবে। হে জনাধিপ! আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক বেদ শাস্ত্রানুযায়ী তাহা আমাকে বলুন।"

জনক উবাচ—

ন বিনা জ্ঞানবিজ্ঞানে মোক্ষস্যাধিগমো ভবেৎ।
ন বিনা গুরুসম্বন্ধং জ্ঞানস্যাধিগমঃ স্মৃতঃ॥ ২২
গুরুঃ প্লাবয়িতা তস্য জ্ঞানং প্লব ইহোচ্যতে।
বিজ্ঞায় কৃতকৃত্যস্তু তীর্ণ স্তদুভয়ং ত্যজেৎ॥ ২৩

"পরোক্ষ জ্ঞানরূপ শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং অপরোক্ষজ্ঞানরূপ বিজ্ঞান ভিন্ন মোক্ষ কিরূপে লাভ হইতে পারে এবং গুরুর উপদেশ ভিন্ন জ্ঞানের সম্ভাবনা কোথায়? নদী উত্তীর্ণ হইতে হইলে যেমন নৌকা এবং কর্ণধার উভয়ই প্রয়োজনীয় তেমনই সংসারনদী পার হইতে হইলে জ্ঞানরূপ নৌকায় আরোহণ করিয়া গুরুরূপী কর্ণধারের সহায়তায় তাহার পর পারে যাইতে হয়। যখন পার হইয়া অপর পারে উপনীত হওয়া যায় তখন যেমন নৌকা এবং কর্ণধারের আর প্রয়োজন থাকে না তেমনই অপরোক্ষ বিজ্ঞানরূপ ব্রহ্ম অনুভূত হইলে শাস্ত্র এবং গুরু কিছুরই আর প্রয়োজন থাকে না।"

অনুচ্ছেদায় লোকানামনুচ্ছেদায় কর্ম্মণাম্।
পূর্ব্বৈরাচরিতো ধর্ম্ম শ্চাতুরাশ্রম্যসংকটঃ ॥২৪
অনেন ক্রমযোগেন বহুজাতিষু কর্ম্মণাম্।
হিত্বা শুভাশুভং কর্ম্ম মোক্ষো নামেহ লভ্যতে ॥ ২৫
ভাবিতৈঃ করণৈশ্চায়ং বহুসংসারযোনিষু।
আসাদয়তি শুদ্ধাত্মা মোক্ষং বৈ প্রথমাশ্রমে ॥ ২৬
তমাসাদ্য তু মুক্তস্য দৃষ্টার্থস্য বিপশ্চিতঃ।
ত্রিষ্বাশ্রমেষু কোহন্বর্থো ভবেৎ পরমভীপ্সিতঃ ॥ ২৭

লোক (জনসমূহ) এবং কর্ম্ম সমূহের যাহাতে উচ্ছেদ না হয় তজ্জন্য চতুরাশ্রমরূপ ধর্ম্ম পূর্ব্ব মহাজনগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বাবস্থাতেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই চতুরাশ্রমরূপ ধর্ম্মের ক্রমশঃ পরিপালন দ্বারা বহুজন্মের কর্ম্মের ভিতর দিয়া মানব, শুভ এবং অশুভ কর্ম্মত্যাগ করতঃ ইহ সংসারে মোক্ষলাভের অধিকারী হয়। বহু যোনি পরিভ্রমণ করিয়া এবং বহু

প্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া বুদ্ধি আদি ইন্দ্রিয়গুলি শুদ্ধ হইলে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমেই মোক্ষলাভ করিয়া থাকে। চিত্তশুদ্ধির নিমিত্তই আশ্রম ধর্ম্মের ব্যবস্থা—যাঁহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে তাঁহার আর উহার প্রয়োজনীয়তা থাকে না; আপনি কৃতকৃত্য এবং মুক্ত হইয়াছেন সুতরাং আপনার অন্য তিন আশ্রমে গমনের কোনই প্রয়োজন নাই।

এখানেই আমরা আশ্রমধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রকৃত তথ্য অবগত হই। কারণ আজন্ম পরমহংস শুকদেব প্রশ্নকর্ত্তা এবং ব্যাসশিষ্য রাজর্ষি জনক তাহার উত্তর দাতা সুতরাং ইহা অপেক্ষা উত্তম মীমাংসা আর সম্ভব নহে। শুক পরমহংসগণের নমস্য এবং জনক গৃহস্থজীবনে রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়াও মুক্তাবস্থা লাভের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এখানে জনক বলিতেছেন, বহুজন্ম ও তদনুযায়ী কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হইলে জীব ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেই মুক্তির অধিকারী হয়, তাহার অন্য আশ্রমের প্রয়োজন থাকে না; নতুবা ক্রমগতি দ্বারা সকলকেই উন্নত হইয়া অবশেষে ইন্দ্রিয়গুলির শুদ্ধি সাধিত হইলে মুক্ত হইতে হয়। সেই জ্ঞান ও বিজ্ঞান লাভের নিমিত্ত গুরুসম্বন্ধ একান্ত প্রয়োজনীয়, নতুবা কাহারও কিছু হইবার সম্ভাবনা নাই! সুতরাং যাঁহারা জনক রাজার দৃষ্টান্তে অনু-প্রাণিত, অথবা শুক হইতে আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁহাদিগকে আগেই দেখিতে হইবে যে তাঁহারা ইন্দ্রিয়বর্গ শুদ্ধ করিয়াছেন কি না? যদি না করিয়া থাকেন তাহা হইলে আত্মপ্রতারণা না করিয়া আশ্রম হইতে আশ্রমান্তরে গমন করিবেন এবং পরিশেষে চিত্তশুদ্ধি হইলে পরম পদের ভাগী হইবেন। নতুবা সন্ন্যাস আশ্রম নাই এরূপ অসার কথা বলিলে নিজের নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায় এবং শাস্ত্রীয় মর্য্যাদার অপলাপ করা হয়। কলিযুগের প্রারম্ভে ভীষ্মদেব শরশয্যায় শায়িত হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট এই মোক্ষধর্ম্মআখ্যান প্রকাশ করেন।

সুতরাং কলিযুগে সন্ন্যাস নাই ইহা শাস্ত্রের অভিপ্রেত হইলে সন্ন্যাস খণ্ডন করিয়া তাহার কোন ব্যবস্থা করিতেন। অনেকে বলেন রাজর্ষি জনক সংসারী হইয়াও শুকদেবের উপদেষ্টা হইয়াছিলেন, সুতরাং আমরাও তাহাই হইব। কথাটা শুনিতে বেশ মধুর, সাধ্যে কুলাইলে মন্দ নহে, তবে চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে কিনা তাহা আগে পরীক্ষা করিতে হইবে এবং স্বয়ং জনক শুকদেব সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহা বিশেষ-রূপে প্রণিধানযোগ্য, তজ্জন্য তাহার কিছু উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা—

অধিকং তব বিজ্ঞানং অধিকা চ গতি স্তব।
অধিকং তব চৈশ্বর্য্যং তচ্চ ত্বং নাববুধ্যসে॥ ৪৪
বাল্যাদ্বা সংশয়াদ্বাপি ভয়াদ্বাপ্যবিমোক্ষজাৎ।
উৎপন্নে চাপি বিজ্ঞানে নাধিগচ্ছসি তাং গতিং॥ ৪৫
ন বন্ধুষন্নুবন্ধস্তে ন ভয়েষস্তি তে ভয়ম্।
পশ্যামি ত্বাং মহাভাগ তুল্যলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনম্॥ ৪৯
যৎফলং ব্রাহ্মণস্যেহ মোক্ষার্থশ্চ যদাত্মকঃ।
তস্মিন্ বৈ বর্ত্তসে ব্রহ্মন্ কিমন্যৎ পরিপৃচ্ছসি॥৫১

"আপনার জ্ঞান আমার অপেক্ষা অধিক, আপনার গতি অধিক এবং আপনার ঐশ্বর্য্যও অধিক কিন্তু আপনি তাহা জ্ঞাত নহেন। বালকত্ব হেতু, ভয়হেতু, আমি মুক্ত কিনা এইরূপ সংশয় হেতু, আপনি অপরোক্ষ জ্ঞানী হইয়াও তৎপদে অধিরূঢ় হইতে পারিতেছেন না। আপনার বন্ধুবর্গে আপনার প্রীতি নাই বা ভয়ের বস্তুতে আপনার ভীতি নাই। হে মহাভাগ! আপনাকে পাষাণ এবং স্বর্ণখণ্ডে তুল্য-

বুদ্ধিসম্পন্ন দেখিতেছি। ব্রাহ্মণদেহ ধারণের যাহা ফল, মোক্ষপদ অধি-রোহণের যাহা ফল তাহা সমস্তই আপনাতে বর্ত্তমান আছে, সুতরাং আমাকে আর কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন ?" যাঁহার বিচার শক্তি আছে তিনি অবগত হইতে পারেন এই গুরু এবং শিষ্য কোন্ স্তরে অবস্থিত। ইঁহাদের জন্য কোন আশ্রমেরই ব্যবস্থা হইতে পারে না অর্থাৎ ইঁহারা যথায় অবস্থান করুন না কেন, মুক্তিপদেই অবস্থিত আছেন। শাস্ত্রানুযায়ী আশ্রমের প্রয়োজনীয়তা দেখান হইল এবার অধিকার অনুযায়ী ইহার বিভাগ দেখান যাইতেছে।

গর্ভাধান হইতে শ্মশান গমন পর্য্যন্ত সমুদয় কার্য্য যাঁহার বেদশাস্ত্রা-নুযায়ী সম্পাদিত হয় তিনিই সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণের উপযোগী। ইহাই শাস্ত্রানুগত ব্যবস্থা ; পূর্ব্বযুগে একমাত্র ব্রাহ্মণ বর্ণেরই তাহার পূর্ণ ব্যবস্থা ছিল, তদ্ভিন্ন সত্বগুণের আধিক্য হেতু ব্রাহ্মণ জাতির জ্ঞানলিপ্সা অতি বলবতী ছিল এবং ধর্ম্মলাভই জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য ছিল এবং তজ্জন্য বাল্যকাল হইতেই তাঁহারা সংসারে আসক্তি অনেকটা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ফলমূলাদি আহারে পরিতৃপ্ত হইতেন এবং কঠোর তপস্যা দ্বারা ইন্দ্রিয়াদির শোধন করিতেন, তজ্জন্য ব্রাহ্মণ জাতিরই উহাতে অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ভোগ করিতে করিতে ত্যাগ হয় না এবং ব্রহ্মে যুক্ত হইয়া ভোগ করা যায় না ; সুতরাং অন্যান্য বর্ণের ক্রিয়া কলাপ ভোগসংশ্লিষ্ট থাকায় ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্ত অন্যের সন্ন্যাসের ব্যবস্থা করা হয় না। সত্বগুণ দুই ভাগে বিভক্ত, মিশ্র সত্বগুণ এবং বিশুদ্ধ সত্বগুণ।

"মিশ্রস্য সত্বস্য ভবন্তি ধর্ম্মাস্ত্বমানিতাদ্যা নিয়মা যমাদ্যাঃ।
শ্রদ্ধা চ ভক্তিশ্চ মুমুক্ষুতা চ দৈবী চ সম্পত্তিরসন্নিবৃত্তিঃ॥"

বিবেকচূড়ামণি।

"বিশুদ্ধসত্ত্বস্য গুণাঃ প্রসাদঃ স্বাত্মানুভূতিঃ পরমা প্রশান্তিঃ।
তৃপ্তিঃ প্রহর্ষঃ পরমাত্মনিষ্ঠা যয়া সদানন্দরসং সমৃচ্ছতি ॥

বিবেকচূড়ামণি।

"অমানিতা, যম, নিয়ম, শ্রদ্ধা, ভক্তি, মুমুক্ষত্ব, দৈবীসম্পত্তি ও অসৎ কর্ম্মে নিবৃত্তি এইগুলি মিশ্র সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম।"

"প্রসন্নতা, আপনাতে আত্মানুভব, পরমশান্তিভাব, সন্তোষ, হর্ষ ও পরমাত্মনিষ্ঠা এই সমস্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম।"

মিশ্র সত্ত্বগুণ ব্রাহ্মণের স্বভাবপ্রাপ্ত ধর্ম্ম তাই তাঁহার জন্য সন্ন্যাস আশ্রম বিহিত।

"পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥ মুণ্ডক। ১।২।১২

"এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্ব্বে ব্রাহ্মণা অনূচানা বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৬।৪।২২।

এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণঃ। বৃ ৫।৫।১

ইত্যাদি অনেকগুলি শ্রুতি অনুযায়ী ব্রাহ্মণেতর অন্য জাতির জন্য সন্ন্যাসাশ্রম বিহিত হয় নাই ; স্মৃতিশাস্ত্রও ইহার অনুগামী। সন্ন্যাসের প্রশংসা করিয়া শ্রুতিতে অনেক কথাই লিখিত আছে। যথা—

"সন্ন্যাসিনং দ্বিজং দৃষ্ট্বা স্থানাচ্চলতি ভাস্করঃ।
এষ মে মণ্ডলং ভিত্ত্বা পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥

ষষ্টিং কুলান্যতীতানি ষষ্টিমাগামিকানি চ।
কুলান্যুদ্ধরতে প্রাজ্ঞঃ সন্ন্যস্তমিতি যো বদেৎ॥"

"সূর্য্যদেব সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণকে দেখিয়া এই বলিয়া পথ ছাড়িয়া দেন যে, এই ব্যক্তি আমার মণ্ডল ভেদ করিয়া পরব্রহ্মে মিলিত হইবে॥"

"যে ব্যক্তি সন্ন্যাস লইয়াছি—এই কথা বলেন তিনি অতীত ষাইট (৬০) কুল এবং আগামী ষাইট কুল পর্য্যন্ত উদ্ধার করেন।" স্মৃতি বলেন—

"অনেন কর্ম্মযোগেন পরিব্রজতি যো দ্বিজঃ।
স বিধূয়েহ পাপ্মানং পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥"

"আশ্রম হইতে আশ্রমান্তরে গমন পূর্ব্বক যিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করেন তিনি পাপ সমুদয় দগ্ধ করিয়া পরব্রহ্মে মিলিত হন।"

বৈদিক মতে সন্ন্যাসী চারি প্রকার এবং সন্ন্যাস ছয় প্রকার। যথা—

(১) বৈরাগ্যসন্ন্যাসী, (২) জ্ঞানসন্ন্যাসী, (৩) জ্ঞানবৈরাগ্য সন্ন্যাসী ও (৪) কর্ম্মসন্ন্যাসী।

(১) বৈরাগ্যসন্ন্যাসিগণ দৃষ্ট এবং শ্রুত বিষয়ে ভোগতৃষ্ণা পরিহার করতঃ পূর্ব্ব পুণ্যফলে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

(২) যাঁহারা জ্ঞানসন্ন্যাসী তাঁহারা শাস্ত্র সহায়তায় পাপপুণ্যচিত লোক সমূহের পরিণাম অবগত হইয়া দৃশ্য প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করেন। তাঁহারা দেহ, শাস্ত্র এবং লোক বাসনা ত্যাগ করিয়া সমুদয় ভোগোৎপাদক কর্ম্মকে ত্যাগ করতঃ সাধনচতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

(৩) যাঁহারা জ্ঞানবৈরাগ্য সন্ন্যাসী তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সমস্ত অভ্যাস

করিয়া, সমস্ত অনুভব করিয়া, জ্ঞান ও বৈরাগ্য দ্বারা স্বরূপ অনুসন্ধান করেন। তাঁহারা দেহ মাত্র রাখিয়া উলঙ্গ অবস্থায় বিচরণ করেন।

(৪) যাঁহারা কর্ম্মসন্ন্যাসী, তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যব্রত শেষ করিয়া গৃহী হন, গৃহী হইতে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন এবং বানপ্রস্থ হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

কর্ম্মসন্ন্যাসী নিমিত্ত ও অনিমিত্ত ভেদে দ্বিবিধ। যখন আতুর অবস্থায় সমুদয় কর্ম্ম লোপ পায়, তখন তাঁহাকে নিমিত্ত সন্ন্যাসী বলে। ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত সমুদয় নশ্বর জ্ঞাত হইয়া এক হইতে অন্য আশ্রমে গমনে যে সন্ন্যাস তাহাকে অনিমিত্ত সন্ন্যাস বলে।

সন্ন্যাসীর ভেদ তালিকা
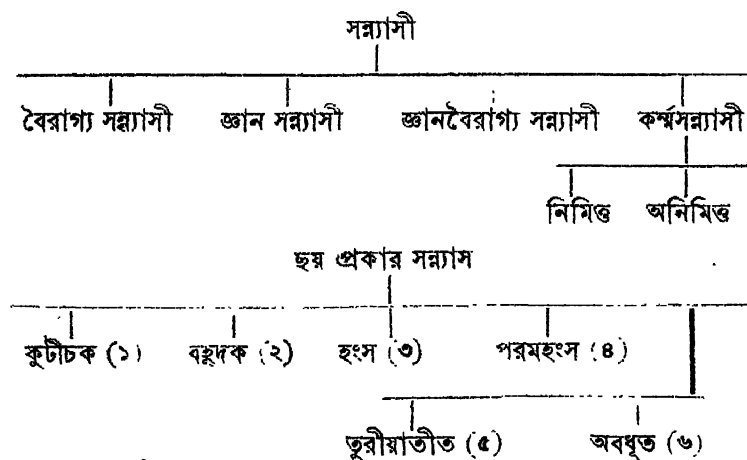
(১) "কুটীচকঃ শিখাযজ্ঞোপবীতী দণ্ডকমণ্ডলুধরঃ কৌপীনকন্থাধরঃ পিতৃমাতৃগুর্ব্বারাধনতৎপরঃ পিঠর-খনিত্র-শিক্যাদি-মন্ত্রসাধনপরঃ একত্রান্নাদনপরঃ শ্বেতোর্দ্ধপুণ্ড্রধারী ত্রিদণ্ডঃ।"

"কুটীচক সন্ন্যাসী শিখা ও যজ্ঞোপবীতধারী হইবেন, তাঁহাকে দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করিতে হইবে ও তাঁহার কৌপীন ও কন্থা থাকিবে। তিনি পিতা মাতা ও গুরু আরাধনতৎপর হইবেন। তাঁহার পাকপাত্র খন্তা শিক্য প্রভৃতি ভোজ্য প্রস্তুতের উপকরণ থাকিবে। তিনি বহুদিন এক স্থানে থাকিয়া অন্ন ভক্ষণ করিবেন ও মন্ত্র সাধনে রত হইবেন। তিনি শ্বেত বর্ণের ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র তিলক ও ত্রিদণ্ড ধারণ করিবেন।"

(২) "বহূদকঃ শিখাদিকন্থাধর স্ত্রিপুণ্ড্রধারী কুটীচকবৎ সর্ব্বসমো মধুকরবৃত্ত্যাষ্টকবলাশী।"

বহূদক সন্ন্যাসী শিখা, কন্থা ও ত্রিপুণ্ড্রক ধারণ করিবেন। অন্যান্য সকল বিষয়েই তিনি কুটীচকের সমান, কিন্তু বিশেষ এই মধুকর যেরূপ একটী পুষ্প হইতে অল্প মাত্রায় মধু সংগ্রহ করে, বহূদক সন্ন্যাসীও সেইরূপ এক গৃহস্থের নিকট হইতে কেবল মাত্র অষ্টগ্রাস অন্ন গ্রহণ করিবেন।

(৩) "হংসো জটাধারী ত্রিপুণ্ড্রোর্দ্ধপুণ্ড্রধারী অসংক্লৃপ্তো মাধুকরান্নাশী কৌপীনখণ্ডতুণ্ডধারী।"

হংস সন্ন্যাসী জটা ও ত্রিপুণ্ড্রের সহিত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবেন। মধুকরবৃত্তিসহকারে গৃহস্থের নিকট কখন কখনও অন্ন গ্রহণ করিবেন। তিনি কৌপীনখণ্ডসমূহ ধারণ করিবেন।

(৪) "পরমহংসঃ শিখাযজ্ঞোপবীতরহিতঃ পঞ্চগৃহেষেকরাত্রান্নাদন-পরঃ করপাত্রী এককৌপীন-ধারী শাটীমেকামেকং বৈনবং দণ্ডমেকশাটীধরো বা ভস্মোদ্ধূলনপরঃ সর্ব্বত্যাগী।"

পরমহংস সন্ন্যাসী শিখা ও যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিবেন। পঞ্চগৃহ হইতে অন্ন সংগ্রহ করতঃ রাত্রিকালে একবার অন্ন গ্রহণ করিবেন। হস্তই তাঁহার ভিক্ষাপাত্র, একমাত্র কৌপীন, একখানা গাত্রবস্ত্র, একটী বংশদণ্ডধারী অথবা কেবলমাত্র বস্ত্রধারী হইবেন এবং ভস্মাবৃতগাত্র ও সর্ব্বত্যাগী হইবেন।

(৫) তুরীয়াতীতো গোমুখঃ ফলাহারী। অন্নাহারী চেদ্ গৃহত্রয়ে দেহমাত্রাবশিষ্টো দিগম্বরঃ কুণপবচ্ছরীরবৃত্তিকঃ।"

তুরীয়াতীত সন্ন্যাসী গাভীর ন্যায় একমাত্র মুখদ্বারা গ্রহণ করিয়া ফলাহার করিবেন। যদি অন্নাহারী হন তবে তিন গৃহে মাত্র ভিক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু তিনি দিগম্বর হইবেন, তাঁহার দেহমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। তিনি শরীরটাকে শবের ন্যায় হেয় বলিয়া জানিবেন।

(৬) "অবধূতস্ত্বনিয়মোঽভিশস্ত-পতিতবর্জ্জন-পূর্ব্বকং সর্ব্ববর্ণেষ্ব-জগরবৃত্ত্যাহারপরঃ স্বরূপানুসন্ধানপরঃ।" নারদ পরিব্রাজকোপনিষৎ।

অবধূত সন্ন্যাসী পূর্ব্বের কাহারও ন্যায় নিয়ম গ্রহণ করিবেন না, অভিশপ্ত এবং পতিত বর্জনপূর্ব্বক সর্ব্ববর্ণের দত্ত দ্রব্য উপস্থিত হইলেই গ্রহণ করিবেন এবং সর্ব্বদা আত্মানুসন্ধানপরায়ণ হইবেন।

এই ছয় প্রকার সন্ন্যাসের উল্লেখ করা গেল ইহা শুধু বৈরাগ্যের ন্যূনতা ও বৃদ্ধি দ্বারা হইয়া থাকে।

ইহারা আবার বিদ্বৎ এবং বিবিদিষা এই উভয় ভাগে বিভক্ত। যিনি জ্ঞান ইচ্ছায় সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করেন এবং চিত্তকে ব্রহ্মভাবে ভাবিত করেন তাঁহার সন্ন্যাসের নাম বিবিদিষা। যাঁহার তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়াছে সুতরাং আর কিছু জ্ঞাতব্য নাই তাঁহাকে বিদ্বৎসন্ন্যাসী বলা যায়।

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—

"ন কর্ম্মণা নপ্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।
অস্মিংশ্চ ত্যাগে স্ত্রিয়োপ্যধিক্রিয়স্তে। মহানারায়ণোপনিষৎ ॥ ১০।৫
ভিক্ষুকীত্যনেন স্ত্রীণামপি প্রাগ্বিবাহাদ্বা বৈধব্যাদূর্দ্ধং
সন্ন্যাসে হধিকারোঽস্তীতি দর্শিতং।"

এই ত্যাগে স্ত্রীলোকেরও অধিকার আছে। তাঁহারা বিবাহ হইবার

পূর্ব্বে বা বিধবা হইবার পর ভিক্ষাশ্রম গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসিনী হইতে পারেন। ঐ আশ্রমে তাঁহারা ভিক্ষাচর্য্যা, মোক্ষশাস্ত্র শ্রবণ এবং একান্তে আত্মধ্যান করিবেন।

যতিধর্ম্ম—"একো ভিক্ষুর্যথোক্তস্তু দ্বৌ চৈব মিথুনং স্মৃতম্।
ত্রয়োগ্রাম স্তথা খ্যাত ঊর্দ্ধন্তু নগরায়তে॥ ৩৫
নগরং হি ন কর্ত্তব্যং গ্রামো বা মিথুনং তথা।
এতত্রয়ং প্রকুর্ব্বাণঃ স্বধর্ম্মাচ্চ্যবতে যতিঃ॥
রাজবার্ত্তাদি তেষান্তু ভিক্ষাবার্ত্তা পরস্পরং।
স্নেহ-পৈশুন্য-মাৎসর্য্যং সন্নিকর্ষাদসংশয়ম্॥
লাভপূজানিমিত্তংহি ব্যাখ্যানং শিষ্যসংগ্রহঃ।
এতে চান্যে চ বহবঃ প্রপঞ্চাঃকুতপস্বিনাম্॥
ধ্যানং শৌচং তথা ভিক্ষা নিত্যমেকান্তশীলতা।
ভিক্ষোশ্চত্বারি কর্ম্মাণি পঞ্চমং নোপপদ্যতে॥
প্রাণযাত্রিকমাত্রঃস্যান্ মাত্রালাভেষ্বনাদৃতঃ।
অলাভে ন বিহন্যেত লাভশ্চৈনং ন হর্ষয়েৎ॥" দক্ষসংহিতা।
"শূন্যাগারং বৃক্ষমূলমরণ্যমথবা গৃহম্।
অজ্ঞাতচর্য্যাং গত্বান্যাৎ ততোঽপ্যত্রৈব সংবিশেৎ॥
বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং হিংসাবেগমুদরোপস্থবেগং।
এতান্ বেগান্ বিষহেদ্ বৈ তপস্বী নিন্দা চাস্য হৃদয়ং নোপহন্যাৎ॥
যস্মিন্ বাচঃ প্রবিশন্তি কূপত্রস্তা দ্বিপা ইব।
ন বক্তারং পুনর্যান্তি স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ॥
অহেরিব গণাদ্ভীতঃ সৌহিত্যান্নরকাদিব।
কুণপাদিব চ স্ত্রীভ্যস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥ ১৩

নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতং।
কালমেব প্রতীক্ষেত নিদেশং ভৃতকো যথা॥ ১৭
অরোষমোহঃ সমলোষ্ট্রকাঞ্চনঃ প্রহীনকোশো গতসন্ধিবিগ্রহঃ।
অপেতনিন্দাস্তুতি রপ্রিয়াপ্রিয় শ্চরন্নুদাসীনবদেষ ভিক্ষুকঃ॥ ৩৩
যেন কেনচিদাচ্ছন্নো যেন কেনচিদশিতঃ।
যত্র ক্বচন শায়ী চ তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥" ১২ মহাভারত

শ্রুতি স্মৃতি প্রতিপাদিত সন্ন্যাস ধর্ম্ম এবং তাহার লক্ষণ সমুদয় কথিত হইল। ইহাতে কিন্তু কলিযুগে সন্ন্যাস নাই এরূপ কোন কথা লিখিত হয় নাই, বরং কলিযুগে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নষ্ট হইয়া যাইবে এইরূপ উল্লিখিত আছে এবং তাহার প্রায় অধিকাংশ লক্ষণই প্রকাশ পাইয়াছে। কোন বর্ণই স্বকর্ম্মে রত নহে বা কোন আশ্রমের ক্রিয়াই কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। ব্রহ্মচর্য্য পালন না করিয়া গৃহী হয় না, সুতরাং মূলে যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য করেন না, তাঁহারা কি প্রকারে গৃহী হইতে পারেন? এবং গৃহীর যে সমুদয় লক্ষণ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে তাহাও কাহারও ভিতর লক্ষিত হয় না। যদি শুধু বিবাহ এবং পুত্রোৎপাদন ও স্ত্রীপুত্রের ভরণ পোষণই গৃহীর লক্ষণ হইত, তাহা হইলে গৃহী আছে ইহা বলা যাইত। গৃহস্থের ধর্ম্ম প্রায় সর্ব্বত্রই লিখিত আছে সুতরাং এ স্থলে তাহার সামান্যই উল্লেখ করা যাইতেছে, যাহাতে দেখা যাইবে গৃহধর্ম্ম এখন বিনষ্ট প্রায়।

"দ্বিতীয়মায়ুষো ভাগংগৃহমেধী গৃহে বসেৎ।
স্বদারনিরতো দান্তোহনসূয়ু র্জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
নাত্মার্থে পাচয়েদন্নং ন বৃথা ঘাতয়েৎ পশূন্।
তথৈবাপচমানেভ্যঃ প্রদেয়ং গৃহমেধিনা॥

ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ সমঃ পিত্রা ভার্য্যা পুত্রঃ স্বকা তনুঃ।
ছায়া স্বা দাসবর্গাশ্চ দুহিতা কৃপণং পরম্॥
তস্মাদেতৈরধিক্ষিপ্তঃ সহেন্নিত্যমসংজ্বরঃ।
গৃহধর্ম্মপরো বিদ্বান্ ধর্ম্মশীলো জিতক্লমঃ॥

মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব (মহাভারত ২০৩ অঃ।)

"গৃহমেধী আয়ুর দ্বিতীয়ভাগ স্বদার নিরত, দান্ত, অসূয়াশূন্য ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া গৃহে বাস করিবেন। তিনি কেবল নিজের জন্য অন্নপাক করিবেন না ; যাঁহারা অন্নপাক করেন না (ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী) তাঁহাদিগকে অন্নদান করিবেন। গৃহীর পক্ষে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার সমান, ভার্য্যা পুত্র স্বীয় দেহের তুল্য, দুহিতা নিজের ছায়ার ন্যায় এবং দাসবর্গ পরম কৃপার পাত্র। সুতরাং ইহাদের দ্বারা উৎপীড়িত হইলেও বিদ্বান্ অনলস গৃহস্থ নিত্য ধীরভাবে উহা সহ্য করিবেন।"

সামান্য কয়টী লক্ষণ লিখিত হইল—ইহা কয়টী গৃহস্থের আছে ? সুতরাং গৃহী নাই। ব্রহ্মচারীও নাই। বন সমুদয় লোপ পাইয়াছে এবং অধিকাংশ লোক ষাট বৎসর বয়সেও বিবাহে রত এবং পুত্রোৎপাদনে অভ্যস্ত সুতরাং বানপ্রস্থ আশ্রমও নাই। গৈরিক বস্ত্রাবৃত অনেক পাওয়া যায় কিন্তু গৈরিকমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করে এরূপ লোক কোথায় ? তাই দুঃখে বলিতে হয়, কোন আশ্রমই নাই। যদি থাকে ত সকলগুলিরই নামমাত্র অবশিষ্ট আছে।

কলিযুগের নরগণ প্রায়শঃ তমোভাবাপন্ন এবং শিশ্নোদরপরায়ণ তাহারই নিমিত্ত জগৎপিতা সদাশিব বলিয়াছেন—গৃহস্থ এবং ভিক্ষুক এই দুইটী আশ্রমই কলিযুগে আছে। যাহারা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া বাস করে তাহারাই গৃহস্থ এবং যাহারা ভিক্ষোপজীবী হইয়া জীবনধারণ করে তাহারাই ভিক্ষুক।

ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীগণও ইহারই অন্তঃনির্ব্বিষ্ট ধরা যাইতে পারে। যাঁহারা দ্বাপর যুগের শেষে উপস্থিত ছিলেন অথবা অন্যান্য যুগে জ্ঞান লাভের নিমিত্ত সাধনা করিয়াও কৃতী হইতে পারেন নাই,—তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা এ সময় জ্ঞানের পরিপক্কতার নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করেন তাঁহাদেরই ভিতর প্রকৃত সন্ন্যাস বা ব্রহ্মচর্য্য দেখা যাইতে পারে, এবং তদ্ভিন্ন সকলেই কলিদুষ্ট। যুগধর্ম্ম প্রভাবে তাঁহাদিগেরও কথঞ্চিৎ মালিন্য দেখা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা ধর্ত্তব্য নহে। একমাত্র বৈষ্ণবেরা পদ্মপুরাণ বা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের সহায়তায় বলিয়া থাকেন যে কলিযুগে সন্ন্যাস নাই। যথা—

"অশ্বালম্ভং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্"।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥

এই সন্ন্যাস শব্দের অর্থ বানপ্রস্থাশ্রম বলিয়া শাস্ত্রজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন। বাস্তবিক বানপ্রস্থাবলম্বী এ যুগে দেখিতে পাওয়া যায় না। আর যদি সন্ন্যাসই ধরা যায় তবে তাঁহাদের শচীর নন্দন মহাপ্রভুই যে আগে মারা যান। "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়" এই বাক্যও অনর্থক হইয়া পড়ে। বরং তাঁহাদের বৈরাগ্য ধারণের জন্য ভেক প্রথা সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয় এবং অযৌক্তিক, যাহার ফলে রাধাকৃষ্ণ লীলায় দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। সন্ন্যাসের বিরুদ্ধে কোন বৈষ্ণব শাস্ত্রে উল্লেখ নাই। বৈষ্ণবদিগের নিমিত্ত শাঠ্যায়ণ উপনিষৎ, তাহাতে শিখাসূত্রত্যাগের ব্যবস্থা নাই, এইটুকু তফাৎ। তাহার কারণ তাঁহারা আমিত্ব সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া "তুমির" সেবা করিতে চান, আমিত্বের চিহ্নস্বরূপ শিখা ও সূত্রের পরিত্যাগ একান্ত অসমীচীন। শাঠ্যায়ণ উপনিষদে যথা—

নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তং ন ব্রহ্মবিৎ পরমং প্রৈতি ধাম।
বিষ্ণুক্রান্তং বাসুদেবং বিজানন্ বিপ্রো বিপ্রত্বং গচ্ছতে তত্ত্বদর্শী॥

"সেই মহান্ পরমাত্মাকে অজ্ঞলোকেরা জানিতে পারে না, অব্রহ্মবিৎ পরমধাম লাভ করিতে পারে না। তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণ বসুদেবতনয় বাসুদেবকে জানিয়াই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন।"

ত্রিদণ্ডমুপবীতং চ বাস কৌপীনবেষ্টনং।
শিক্যং পবিত্রমিত্যেতদ্বিভৃয়াদ্ যাবদায়ুষম্॥
পঞ্চৈতাস্তে যতের্মাত্রাস্তা মাত্রা ব্রহ্মণে শ্রুতাঃ।
ন ত্যজেৎ যাবদুৎক্রান্তিমন্তেঽপি নিখনেৎ সহ॥

"ত্রিদণ্ড, উপবীত, দর্ভনির্ম্মিত মেখলা, কৌপীন এবং শুক্লবস্ত্র, সন্ন্যাসী এইগুলি যাবজ্জীবন ধারণ করিবেন। ব্রহ্মা এই কয়টী সন্ন্যাসের চিহ্ন বলিয়াছেন, সুতরাং মৃত্যু না হইলে তাহা ত্যাগ হইতে পারে না এবং মৃত্যু হইলেও শবদেহের সহিত তাহা প্রোথিত করিবে।"

"ত্রিসন্ধ্যাং শক্তিতঃ স্নানং তর্পণং মার্জ্জনং তথা।
উপস্থানং পঞ্চযজ্ঞান্ কুর্য্যাদামরণান্তিকম্॥
দশভিঃ প্রণবৈঃ সপ্তব্যাহৃতিভি শ্চতুষ্পদা।
গায়ত্রী জপযজ্ঞশ্চ ত্রিসন্ধ্যং শিরসা সহ॥" ইত্যাদি

এইগুলি তাঁহাদের নিত্যকর্ম্ম। কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞদিগের নিকট ইহা সাম্প্রদায়িক বলিয়া কথিত হয়। মোট কথা তাঁহাদের শিখাসূত্রত্যাগ এবং গৈরিক ধারণে বিশেষ আপত্তি দেখা যায়। বিদ্বানেরা ঐ

সমুদয় আদর করেন না, কারণ বেদে শিখাসূত্রত্যাগের ব্যবস্থাই দেখিতে পাওয়া যায় তবে যাহাদের বৈরাগ্য মন্দ বা জ্ঞানের পরিপক্কতা নাই তাঁহাদের পক্ষে ইহাই সমীচীন বলা যাইতে পারে। কলিযুগে বেদাচার নাই বলিয়া অনেকে তন্ত্রাচার সমর্থন করেন এবং দেশকালের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে তাহাতে তন্ত্রের প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হয়। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রকার উপাসনা বা যজ্ঞাদি তন্ত্রোক্ত মন্ত্রাদি দ্বারা নিষ্পন্ন হইতেছে। বৈদিক কর্ম্ম দূরে থাক্ তান্ত্রিক ক্রিয়া অনুষ্ঠানেরই অধিকার দিন দিন হারা হইয়া আমরা এক অপূর্ব্ব অবস্থায় উপনীত হইতেছি। তান্ত্রিক দিব্যাচার এবং বৈদিক ধর্ম্ম এক, সুতরাং তন্ত্র অবহেলার বস্তু নহে। বরং তন্ত্রের সূক্ষ্মদৃষ্টি প্রশংসা পাইবার উপযোগী; তাই এ যুগের সর্ব্ব বর্ণের নিমিত্ত যে সন্ন্যাস উল্লিখিত হইয়াছে তাহাই লিখিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করা যাইতেছে। তন্ত্রমতে অবধূত আশ্রমই সন্ন্যাস নামে অভিহিত; অবধূত চারি প্রকার পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে! চতুর্ব্বিধ অবধূতের মধ্যে শৈবাবধূত দুই প্রকার পরিব্রাজক ও পরমহংস। যতি বা ব্রাহ্মাবধূত ও দুই প্রকার; পরিব্রাজক পরমহংস বা হংস। অপূর্ণ শৈবাবধূত ও অপূর্ণ ব্রাহ্মাবধূত সংসারী হইলেও পরিব্রাজকের মধ্যে গণ্য হইতেছেন। সংসারস্থিত অবধূতকে যদি পৃথক্‌ভাবে ধরা যায় তাহা হইলে ছয় প্রকার অবধূত হইবে। যথা—প্রথম শৈবাবধূত, ইনি সংসারে থাকিয়াও সন্ন্যাসী এইজন্য শৈবাবধূত নামে অভিহিত। দ্বিতীয় পরিব্রাজক; পরিব্রাজকতা শৈবাবধূতের দ্বিতীয় অবস্থা, সংসার পরিত্যাগ করিয়া তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক জপ পূজাদি করাই ইঁহার প্রধান কার্য্য। ইনি শক্তি লইয়া নিয়মিত সাধন করিতে পারেন। তৃতীয় পরমহংস; ইহা শৈবাবধূতের তৃতীয় অবস্থা; ইনি কর্ম্মত্যাগী কৌপীনধারী সন্ন্যাসী; ইনি যোগ ভোগ ও নিয়মানুসারে

উপযাচিকা কামিনীর কামনা পূরণ করিতে পারেন। চতুর্থ যতি বা ব্রাহ্মাবধূত; ইনি প্রথম শৈবাবধূতের ন্যায়; পরন্তু স্বশক্তিভিন্ন শৈব-বিবাহে বিবাহিত পরশক্তিগ্রহণের অধিকার নাই। পঞ্চম ব্রহ্মাবধূত পরিব্রাজক, ইহার কার্য্য দ্বিতীয় শৈবাবধূতের সদৃশ; কিন্তু উপ-যাচিকা কামিনী সম্ভোগের অধিকার নাই। পরন্তু গুরুর উপদেশে যোগসাধনের জন্য শক্তি গ্রহণ করিতে পারেন। ষষ্ঠ হংসাবধূত; ইনি তৃতীয় শৈবাবধূতের ন্যায়—স্ত্রীসংসর্গ বা ধাতু পরিগ্রহ কোন প্রকার কার্য্যে ইঁহার অধিকার নাই। ইতি

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের টীকা—জগদ্বন্ধু তর্কালঙ্কার কৃত।

ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥